একবিংশ অধ্যায়

মহাযাত্রার পথে

১

আজ ৮ই মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ। বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, রবিবার, অক্ষয় তৃতীয়া।

ঠাকুরবাড়ি। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। কলিকাতা। এখন সন্ধ্যা হয় হয়। শ্রীম নিজের কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দ্বিতলের সিঁড়ির কাছে যাইতেছেন। অন্তেবাসী সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া শ্রীমকে পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন, হাত মুখ আবার ধুয়ে কুলকুচো করে ওপরে ঠাকুরঘরে গিয়ে বসো। অন্তেবাসী আবার নিচে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিলেন। শ্রীম সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তেবাসীকে সস্নেহে বলিলেন — পায়ে হাতটা ঠেকেছিল কি না, তাই ঐ কথা বললাম।

সাধুদের পায়ে ভক্ত কিন্তু হাত দিলে সাধুরা হাত ধুইতে বলেন, শ্রীম বারণ করেন। বলেন — না, মাথায় হাত দাও। তাতেই শুদ্ধ হবে। শিরে গঙ্গা রয়েছেন। কিন্তু তাঁহার পায়ে হাত দিয়া জোর করিয়া স্পর্শ করিলে তিনি হাত মুখ ধুইতে ও কুলকুচো করিতে বলেন। কি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সাধু সাক্ষাৎ নারায়ণ!

অন্তেবাসী দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে থাকেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে কাল বেলুড় মঠে আসিয়াছেন। আজ শ্রীমকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। তিনি অমূল্য, হিমাংশু ও স্বামী জিতাত্মানন্দের সঙ্গে খেয়া পার হইয়া বরাহনগর হইতে বাসে করিয়া আসিয়াছেন। স্বামী জিতাত্মানন্দ বাগবাজার নামিয়া গেলেন।

কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে শঙ্কর ঘোষের লেনের মোড়ে সকলে ট্রাম হইতে নামিয়া ঠাকুরবাড়িতে প্রবেশ করিলেন।

অমূল্য উপরে গেলেন। অন্তেবাসী অমূল্যর হাত দিয়া বাবা বৈদ্যনাথের

পেঁড়া প্রসাদ শ্রীম-র কাছে পাঠাইলেন। তিনি হাত মুখ ধুইতেছেন নিচে। শ্রীম অন্তেবাসীর আগমন সংবাদ পাইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির কাছে যাইতেছিলেন।

তিনতলার ছাদে অন্তেবাসী বসিয়া আছেন স্বামী রাঘবানন্দের সঙ্গে। শ্রীমও আসিয়া পাশে বসিলেন। আরতি আরম্ভ হইবার অল্প বিলম্ব।

শ্রীম অতি আদরের সহিত অন্তেবাসীকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলেন — ভয় হয়, পাছে শরীরটা ভেঙ্গে না পড়ে। প্রায়ই শুনছি কিনা অসুখ। অন্তেবাসী বলিলেন, শরীর তো প্রায় ভেঙ্গে পড়েছে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম — ক'টা case (কেস) দেখলাম। নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। সাধুজীবন 'বেওয়ারিস মাল', রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) বলতেন। ক'জনের দেখলাম অল্প বয়সে শরীর গেল। কাজকর্ম আবার আছে। অরগ্যানিজেশনে (সঙ্ঘে) থাকলে ওসব করতে হয়। কারো কারো ওসব সুট (suit) করে না। একটা গাছ বেশ বাড়ছিল। তার নিচে ভিয়ান বসালে। ওমা, অমনি আর সে তেজ নেই। মরমর হয়ে পড়েছে।

বলাই — বৈদ্যনাথের প্রসাদী এই পেঁড়া এনেছেন ইনি (শ্রীম প্রণাম করিলেন)।

অন্তেবাসী — এতে মঠের প্রসাদও রয়েছে। (শ্রীম পুনরায় যুক্ত করে প্রণাম)।

শ্রীম নীরব। শরীর শীর্ণ। মুখে বেদনার ছায়া।

অন্তেবাসী। আপনার শরীর কেমন?

শ্রীম — এই চলছে। বেদনাটা যা কষ্ট দিচেছ। সেই যে দেখে গিছলে (পূজার ছুটিতে) তারপর থেকে চলছেই। তুমি তো দেখে গিছলে?

দারুণ বেদনায় শ্রীম দেড় ঘন্টা আর্তনাদ করিয়াছিলেন অন্তেবাসীর গলা জড়াইয়া সেই দিন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞা হাঁ। পরদিনই বিদ্যাপীঠে যেতে হয়েছিল।

শ্রীম — সেইটাই চলছে।

অন্তেবাসী — আজ আবার খাটুনিও হয়েছে। ও বাড়িতে (মর্টন স্কুলে) যেতে হয়েছিল। আজ তো মটকোর (জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণের) বিয়ে। আগে

জানলে আজ আসতাম না।

শ্রীম — না, তেমন খাটুনি নেই। তবে এই বইটা (কথামৃত পঞ্চম ভাগ) বের হচেছ। এটাতে খুব খাটুনি।

অন্তেবাসী — শরীরে যদি সহ্য না হয়, তবে কি কাজ এই বই বের করার?

শ্রীম — ঐ সব চিন্তা (বের করার চিন্তা) করলে বেড়ে যায়। তখন আর কিছুই মনে থাকে না।

আরতি আরম্ভ হইল। শ্রীম উঠিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তরা গাহিতেছেন, 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।' তারপরে গাহিতেছেন প্রণাম —

স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এইবার ঠাকুরের ভোগ নিবেদন করা হইতেছে। শ্রীম প্রণাম করিয়া নিচে চলিয়া গেলেন, বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। অল্প অল্প বেদনা চলিতেছে।

ভোগ শেষ হইলে ভক্তরা পুনরায় গাহিতেছেন, 'ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেঢ্য' — এই স্তব। এরপর দেবী প্রণাম — 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে'। তারপর 'ভয় হর মঙ্গল দশরথ রাম' ও 'কনকাম্বর কমলাসন - জনকাখিল ধাম'। তারপর প্রণাম —

'আপদামপহর্তারং দাতারং সর্বসম্পদাম্।
লোকাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥'

শ্রীম দোতলার ঘরে শুইয়া আছেন। ডান হাতে অল্প অল্প বেদনা। আরতি শেষ হইলে একজন ভক্তকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, জগবন্ধু মহারাজকে বেশ করে খাইয়ে দাও। পর পর তিনজনের দ্বারা বলিয়া পাঠাইলেন একই কথা — ভাল করিয়া খাওয়াইতে। আর বলিলেন — বড়ই দুঃখ হচেছ, তাঁর খাওয়াটা আমরা দেখতে পেলাম না। হিমাংশু বেশ পরিতোষ করিয়া ভোজন করাইলেন সাধুকে বাজার হইতে লুচি, তরকারী, মিষ্টি, আম কিনিয়া আনিয়া।

শ্রীম নিজ কক্ষের মেঝেতে বসিয়া আহার করিতেছেন। ভক্তরা আসিয়া অন্তেবাসীকে দোতলায় লইয়া গেলেন আহার-রত শ্রীমকে দর্শন করিবেন। তিনি বারান্দায় বসিয়া দেখিতেছেন। ভক্তরাও কেহ কেহ বারান্দায় বসা। হিমাংশু কেবল শ্রীম-র ঘরে।

শ্রীম-র পরনে একখানা গামছা। শ্রীম খাইতেছেন দুধ আর রুটি। হিমাংশু হ্যারিকেনে নুনের পুঁটলি গরম করিতেছেন। শ্রীম বাঁ হাতে ঐ পুঁটলি লইয়া ডান হাতের কুনুই-এ সেঁক দিতেছেন।

একটা টিফিন কেরিয়ারের বাটিতে শ্রীম একটা ল্যাংড়া আম রাখিয়া খাইতেছেন, আর হিমাংশুর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করিতেছেন।

শ্রীম — 'ঘায়েল কী দরদ ঘায়েল বোঝে অন্যে না বোঝে কই?' (ঘায়ল কী গতি ঘায়ল জানে অউর ন জানে কোয় - মীরার ভজন)। আচছা, ঐ যে গেলেন তাঁর মুখে ভারি সুন্দর শোনায়। আজকাল যেন কোথায় থাকেন?

হিমাংশু — আপনাকে চিঠি লিখেছিলেন তো?

শ্রীম — হাঁ। বেদনায় সব ভুলিয়ে দেয়, কিছু মনে থাকে না। কোথায় ঢাকার ওদিকে থাকেন। ওঁর মুখে বেশ হয় — 'ঘায়েল কী দরদ ঘায়েল বোঝে অন্যে না বোঝে কই।'

বেদনায় সব ভুলিয়ে দেয়। এর মানে অন্য চিন্তা করতে দেবেন না। এক চিন্তা নিয়ে থাক। নানান্ খানা করতে আর দেবেন না।

শ্রীম আম চুষিয়া খাইতেছেন।

হিমাংশু — ঐ বুড়ো ডাক্তারটি খুব ভাল। দেখালে হয়। বললেই আসবেন।

শ্রীম — না। তাঁকে এনো না। বুড়ো মানুষ। ওষুধ বলে দিলেই হবে। আমটা খেতে বেশ। বেশ মিষ্টি। বেদনা কম লাগে (হাস্য)।

হিমাংশু — একজন ডাক্তার বলেন, ল্যাংড়া আম রোগীর আহার, রাত্রে জলে ভিজিয়ে রেখে সকালে খেলে।

শ্রীম — (সহাস্যে) দেখ দিকিন্ আছে কিনা আর, তুমি যেকালে এতো recommend (গ্রহণযোগ্য বলে প্রশংসা) করছো।

হিমাংশু প্রসাদী আমের একটি আঁটি ও দুইটি চাক্‌লা দিলেন। সামনেই পাতায় দোকানের আলুর তরকারী রহিয়াছে। শ্রীম উহা হইতে খানিকটা

মুখে দিলেন চাট্‌নীর মত।

শ্রীম — এটা নোনতা, বেশ খেতে।

শ্রীম-র আহার শেষ হইলে পুরানো ঘি গরম করিয়া ডান হাতে মাখান হইল।

হিমাংশু — যেদিন মঠে গিয়েছিলেন সেদিন একজন ডাক্তার একটা ওষুধ দিছলেন। কোথায় সেটা?

শ্রীম স্মরণ করিতে পারিতেছেন না।

মনোরঞ্জন (বারান্দা হইতে) — ঐ যে এক ভদ্রলোক আপনার হাতে দিলেন।

তবুও শ্রীম-র স্মরণ হইতেছে না। খানিকপর স্মরণ হইল।

শ্রীম — ও-ও! হাঁ ঈশান কবিরাজের (শ্রীম-র ভগ্নীপতি, ঠাকুরের চিকিৎসক) বাড়ি থেকে দিছলো। দেখ, সব ভুলে গেছি। টেবিলে রয়েছে বটে।

একজন সাধু তিনতলার ছাদে বসিয়া আছেন অন্ধকারে একা। ভাবিতেছেন, শ্রীম বলেন ঠাকুর কৃপা করে তাঁর সব রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন — সাকার নিরাকার উভয়ই। তাঁর এই রূপ দেখে ভক্তদের ধাঁধাঁ লেগে যেতো। এদিকে প্রহেলিকা — বাইরে পূজারী ভিতরে জগদীশ্বর!

এখন বলেন, ‘বেদনায় সব কিছু ভুলে যাই, মনে থাকে না।’ আবার বলেন, ‘এখন কেবল ঠাকুর ও তাঁর কথামৃত মনে থাকে। নামরূপ সব ভুল হয়ে যাচেছ।’

কখনও দেখা যায় বেদনার সময় কথামৃত লিখিতে বসিয়াছেন। বারণ করিলে বলেন — না, ঠাকুরের কথামৃতের চিন্তায়, তার আনন্দে, বেদনা ভুল হয়ে যায়।

শ্রীম কখনও বলেন, যে কাশী দেখেছে তার ভেতরে কাশীর জ্ঞান জাগ্রত থাকে, বাইরে যদিও দেখা যায় নানা কাজে ব্যাপৃত। কাশী মানে ঈশ্বর, ব্রহ্ম।

শ্রীম ভগবান অবতারের অন্তরঙ্গ শক্তিশালী বিশিষ্ট পার্ষদ। ঠাকুরের চৈতন্যাবতারেরও লীলাসহচর। অতএব নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি। এক সত্তা, ‘চাপরাশ’-ধারী, ‘ভাগবতের পণ্ডিত’ শোক-দুঃখসন্তপ্ত জীবগণকে ঠাকুরের

'কথামৃত' বর্ষণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রদানকারী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ শ্রীম।

সাধু ভাবিতেছেন — শ্রীম একবার বলছেন, 'সবকিছু ভুল হয়ে যায় বেদনায়'। আবার বলেন, 'কথামৃতের আনন্দে বেদনা ভুল হয়ে যায়'। এ দু'টি বিরুদ্ধ ভাব নিশ্চয়, আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ। বেদনায় জগতের জ্ঞান, দেহজ্ঞান থাকে। ঠাকুরের 'কথামৃতে'র চিন্তায়, ব্রহ্মচিন্তায় বেদনা ভুল হয়ে যায়।

শ্রীমতে দেখছি, ভুল ও ব্রহ্মচেতনা একাধারে একসঙ্গে। ব্রহ্ম ও মায়া একাধারে, একটি স্বচ্ছ পর্দার ব্যবধান মাত্র। এটা কি নিরন্তর জাগ্রত সমাধি? এই ব্রহ্ম ও মায়া একাধারে একসঙ্গে ঠাকুরের জীবনে সর্বদা দর্শন হতো।

সাধু আবার ভাবিতেছেন, পার্ষদদেরও যদি এই অবস্থা, আমাদের দশা কি হবে? মনের ভিতর হইতেই উত্তর আসিল — শরণাগতি আর প্রার্থনা। আর শ্রীম-র অভয়বাণী বাপ-মাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে নিশ্চিন্তে। ঠাকুর সদা ভক্তসঙ্গে বিরাজ করেন। সাধু সকাতরে প্রার্থনা করিতেছেন, ঠাকুর সদা দেখো, সদা রক্ষা করো, তোমার অভয় পদে মন রেখো।

পূর্ণেন্দু ও এটর্নী বীরেন বসুর প্রবেশ। তাঁহারা অন্ধকারে সাধুকে দেখিতে পান নাই। একজন ভক্তের মুখে সাধুর নাম শুনিয়া বীরেন সাধুর কাছে আসিলেন এবং অতি ভক্তিভরে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। আর আত্মীয়ের মত সাধুর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। বলিলেন, আপনাদের দেখলে ভরসা হয়। মনে হয়, বন্ধুবান্ধবরা কোথায় রয়েছেন ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ছেড়ে! আমাদের কথা কখনও একটু স্মরণ করবেন। সংসারে কোথায় পড়ে আছি। ঘরের কথা, বড় ছেলের পড়ার কথা কহিলেন। আবার সপ্রেম ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ভাবটি বড়ই মধুর। একটু পর গুহ মহাশয় আসিয়াও প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন।

সাধু ছাদে বসিয়া ভাবিতেছেন, ঠাকুর বুঝি এবার আমাদের অনাথ করবেন। শ্রীম-র শরীরের যা অবস্থা। নিজে বলেছেন, 'দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি'। হায়, আমাদের কি দুর্দিন হবে! সাধু আর ভাবিতে পারিলেন না।

রাত্রি প্রায় এগারটা। বলাই, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু আর সাধু বসিয়া

শ্রীম-র অসুখের কথা আলোচনা করিতেছেন। একটানা আট মাস ধরিয়া বেদনা চলিতেছে। সকলেই চিন্তিত।

এগারটার পর ভক্তরা শুইলেন ছাদে। সাধু শুইলেন 'নাট মন্দিরে' ঠাকুরের মন্দিরের পাশে।

পরের দিন সকালে ভক্তগণ ছাদে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। অন্তেবাসীও আছেন। শ্রীম দ্বিতলের নিজের কক্ষ হইতে আসিয়াছেন। এখন সকাল ছয়টা। মঠের কথায় মহাপুরুষ মহারাজের কথা উঠিল। শ্রীম খুব ভাবিত। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন যাহাতে মহাপুরুষ মহারাজ সুস্থ থাকেন। বলিলেন, যতদিন এঁদের শরীর থাকে ততই জগতের কল্যাণ, বিশেষ করে আমাদের ও মঠের কল্যাণ। এঁরা ঠাকুরের link (যোগসূত্র)। এঁদের দেখলে ঠাকুরের কথাই মনে হয়। (অন্তেবাসীর প্রতি) তুমি যে লিখছ ডায়েরীতে মহাপুরুষের কথা এ খুব ভাল, পরে অমূল্য ধন হবে এসব কথা। অন্তেবাসী বলিলেন — একটু লেখা শুনুন, বাকী আছে। শ্রীম বলিলেন, শোনাও। অন্তেবাসী পড়িতেছেন—

১৯শে জুন ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। বেলুড় মঠ। সকাল প্রায় সাতটা। শ্রীমহাপুরুষের ঘর। তিনি পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য, প্রায় দিগম্বর। সেবক শৈলেশ ঘরের মেঝেতে বসিয়া 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজের সব হেডিং পড়িয়া শুনাইতেছেন।

একটি সাধু গৃহে প্রবেশ করিলেন। ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন পাদস্পর্শ করিয়া। মহাপুরুষ শৈলেশকে বলিলেন, 'দেখ কি খবর। শ্রীমাস্টার মহাশয় সম্প্রতি স্নায়ুশূল বেদনায় হঠাৎ আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই। তাই শ্রীম-র সম্বন্ধে সব সংবাদ লইতে শৈলেশকে আদেশ করিলেন। সাধু নিজেই মহাপুরুষ মহারাজকে তাঁহার সংবাদ বলিলেন। তিনি সব শুনিয়া আনন্দে বলিতেছেন, অস্পষ্ট আধ আধ স্বরে — মাস্টার বেঁচে গেলেন, মাস্টার মশায় বেঁচে গেলেন। যা, ঠাকুর এ টালটাও সামলিয়ে নিলেন। বেশ হয়েছে, আচছা।

সাধু বলিলেন, আজ আমি দেওঘর যাব। মহাপুরুষ প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন — বেশ যাও, আচছা যাও বাবা। খুব ভাল। এই সাধুর শরীর এখানে আসিলেই খারাপ হয়। তিনি নিচে নামিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী

রাধেশ্যাম ভাতে ভাত রাঁধিয়াছেন। সাধু আহার করিয়া হাওড়া স্টেশনে রওনা হইলেন। এখন সওয়া নয়টা, সঙ্গে অমূল্য। হেম পালের গলিতে এক ঘন্টা অপেক্ষা করিবার পর বাস আসিল।

রেল গাড়ীতে বসিয়া সাধু আপন মনে ভাবিতেছেন, মঠ আনন্দধাম। ঠাকুর, মা, স্বামীজী প্রভৃতির এখানে জীবন্ত ও নিত্য আবির্ভাব। এখন শ্রীমহাপুরুষাদি পার্ষদগণের বাসস্থান। এমন স্থান কোথায় পাওয়া যায়!

মঠে আনন্দে থাকিতে পারেন তিনি , যাঁহার শরীর সুস্থ ও কার্যক্ষমতা প্রচুর। কিন্তু যাঁহার শরীর অসুস্থ ও দুর্বল তাঁহার পক্ষে কষ্টকর। আমার শরীর অসুস্থ। এই এক মাস মঠের বিশেষ সেবা করিতে পারি নাই। তাহাতে মন সঙ্কুচিত হয়। অপরেও কেহ কেহ বিরক্ত হন। ইহাতে মন আরও খারাপ হয়। কিন্তু ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিলে অপরের বিরক্তি ও নিজের সঙ্কোচ দূর হইয়া যায়।

মঠে আসা কেন? ঠাকুরের নিত্য আবির্ভাব এখানে! ইহার ফলস্বরূপ জমাটবাঁধা আনন্দ এখানে। এই আনন্দ ও শান্তি অতি সহজ ও স্বাভাবিকভাবে উপভোগ করা যায়। আর সর্বদাই ঠাকুরের সন্তানগণকে এখানে দর্শন হয়, আর সাধুসঙ্গ লাভ হয়। এখনও মহাপুরুষ ও খোকা মহারাজ বিদ্যমান। আমার তো বরাবর ইচছা এখানেই স্থায়ীভাবে থাকি। অসুস্থ শরীরের জন্য সম্ভব হয় না। এখানে সেবা করার স্থান, সেবা লইবার স্থান নহে। অবশ্য শয্যাশায়ী হইলে সেবা লইতে বাধ্য হয়।

ঠাকুর সহায়! তিনিই আমাদের একমাত্র ভরসা — সকল সাধুগণের! তিনি যখন যেভাবে যেখানে রাখেন সেখানেই তাঁহার শরণাগত হইয়া থাকিতে হইবে। তাঁর কৃপাতে সর্বত্র সর্বদা শান্তি ও আনন্দলাভ হয়। তিনিই আমার ও সকলের একমাত্র ভরসা! জয় রামকৃষ্ণ!

শ্রীম — বাঃ, কি উদ্দীপক এই বিবরণ! ভবিষ্যতে মঠের ইতিহাসে এসব জীবন্ত ছবি থাকবে। কত লোকের উপকার হবে এই ডায়েরীতে। তত্ত্বকথার চাইতে এসব জীবন্ত বিবরণ অধিক মূল্যবান সাধকদের কাছে।

২

অপরাহ্ণ একটা। গঙ্গাগর্ভ। দুইজন সাধু — স্বামী ভাস্করেশ্বরানন্দ ও

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ খেয়া নৌকাতে গঙ্গা পার হইতেছেন। সঙ্গে ভক্ত বলাই। তাঁহারা বেলুড় মঠ হইতে কলিকাতা যাইবেন। কুঠিঘাটে নামিয়া বরাহনগর পোস্ট অফিসে একটা তার করিলেন। স্বামী শুদ্ধানন্দ পুরীর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের উৎসর্গ-উৎসবে আনন্দ প্রকাশ ও শুভ কামনা করিতেছেন। তারপর বাসে সকলে শ্যামবাজার পর্যন্ত গেলেন।

আজ ১৪ই মে শনিবার, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনস্থ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। ফটকের ঘরে উকীল ললিত ব্যানার্জি বসা। তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে অন্তেবাসী 'নমঃ ভক্তেভ্যঃ' বলিয়া অভিবাদন করিলেন। দেখিবার ইচ্ছা ছিল, দেখা হইল। তাহাতেই উভয়ের আনন্দ।

দ্বিতলে উঠিয়া অন্তেবাসী শুনিলেন শ্রীম নিজের ক্ষুদ্র কক্ষে বসিয়া 'কথামৃতে'র পঞ্চম ভাগ লিখিতেছেন। সাধু ও ভক্তেরা তাই তিনতলার ছাদে বসা। অন্তেবাসী ঠাকুর প্রণাম করিলেন। এখানে শ্রীশ্রী ঠাকুরের পাদুকা নিত্য পূজা করা হয়। শ্রীশ্রীমা এই পূজার প্রতিষ্ঠা করেন।

আজ শনিবার বলিয়া বহু ভক্ত সমাগম হইয়াছে। ভাটপাড়ার ললিতবাবু প্রভৃতি প্রাচীন ভক্তগণও আসিয়াছেন। দুইজন ব্রহ্মচারী আসিলেন। উভয় ব্রহ্মচারীরই নাম নগেন (পরে স্বামী কৃপানন্দ ও মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ)। সাধু ও ভক্তগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্রীম-র অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। এখন সন্ধ্যার খানিক বাকি।

সংবাদ আসিল লেখা শেষ করিয়া শ্রীম একা বসিয়া আছেন দোতলার ক্ষুদ্র কক্ষে। অন্তেবাসী নিচে নামিয়া গেলেন। শ্রীম মাদুরের উপর দক্ষিণমুখী বসা। পাশেই খাট বিছানা। চাদর ময়লা। পূর্ব প্রান্তে টেবিল, তাহাতে অনেক পুস্তক। পশ্চিমে রান্নার সরঞ্জাম। কুকার, এনামেলের বাসন প্রভৃতি। দক্ষিণের জানালার পাশে জলের কুঁজো আর গ্লাস।

শ্রীম-র শরীর কৃশ, চেহারা রুক্ষ। পরনে সাদাপাড় ধুতি, গায়ে লংক্লথের পাঞ্জাবী। গলায় সোয়েটার জড়ান। হাতে নিউরলজিক পেন। পোশাকও ময়লা। অন্তেবাসীকে দেখিয়া শ্রীম সস্নেহে আহ্বান করিলেন — আসুন জগবন্ধুবাবু, আসুন। অন্তেবাসী পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। তারপর শ্রীম-র দক্ষিণ বাহুমূলে ও পিঠে হাত বুলাইয়া ব্যথিত স্বরে বলিলেন — আহা, কি রকম শুকিয়ে গেছে সব। বরাবর শ্রীম-র শরীর দীর্ঘ ও হৃষ্টপুষ্ট।

শ্রীম স্বাভাবিক প্রশান্ত বদনে উত্তর করিলেন — এর এই অবস্থাই হবে। তাই হয়ে আসছে চিরকাল। এর ভেতর যিনি আছেন, তিনিই কেবল অজর অমর অভয় সচিচদানন্দ। যতদিন শরীর তত দিনই দুঃখ। ষড়বিধ বিকার ধর্ম এর।

জীবের, ভক্তের এইটিই স্বরূপ। এইটে জেনে সংসারে থাকা। এইটিকে লক্ষ্য করে ঠাকুর বলেছিলেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে সংসারে থাকা'।

অন্তেবাসী (অনুযোগের স্বরে) — এই সন্ধ্যের অন্ধকার হয়ে যাচেছ, এখনও নাকি লিখছিলেন?

শ্রীম (স্নেহের শাসন মানিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে) — হাঁ। এতে ভালই লাগছিল। যেমন মাছ মরমর হয়েছে। আর জল পেয়েছে। অমনি সোঁ করে দৌড়। লিখতে লিখতে সব ভুলে গিছলাম — বেদনা।

এখন অত্যন্ত গরম। তাহাতে আবার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। অন্তেবাসী তালপাতার পাখা লইয়া শ্রীমকে হাওয়া করিতেছেন। একটু পর শ্রীম বলিতেছেন — থাক্ থাক্ সন্ধ্যে হয়েছে থাক্।

দুই জন নূতন ভক্তের প্রবেশ। তাঁহারা কেলনার কোম্পানীতে কাজ করেন। প্রণাম করিয়া বসিলে তাঁহাদের সঙ্গে দুই চারিটি কথায় কুশল প্রশ্ন করিলেন।

এইবার অন্তেবাসীকে বলিলেন, যান্ এবার এদের নিয়ে ওপরে। এখন আরতি হবে।

তিন তলায় আরতি হইতেছে। ভক্তগণ নাটমন্দিরে ও ছাদে বসিয়া যন্ত্রসহায়ে গাহিতেছেন, 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়'।

শ্রীম ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন — গায়ে নামাবলী। ভিতরে গরম বলিয়া আরতি শেষ না হইতেই বাহির হইয়া আসিলেন।

একজন স্বগতঃ ভাবিতেছেন শ্রীমকে দেখিয়া, বৃহদারণ্যকের 'বালাকি-অজাতশত্রু' সংবাদের কথা মনে পড়ছে। গৃহস্থাশ্রমী জনক। তাঁর কাছে গৃহী, সন্ন্যাসী সকলে যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য। প্রতিবেশী ঈর্ষান্বিত হইয়া 'জনেকায় জনেকায়' বলিয়া উপহাস করে। জনক ত্যাগী শিরোমণি শুকদেবেরও গুরু। ব্রহ্মজ্ঞানে ত্যাগী গৃহী অভেদ।

অন্তেবাসী রাত্রিবাস করিলেন 'নাট মন্দিরে' বলাই ও সুখেন্দুর সঙ্গে।

শ্রীম-র কক্ষের পাশে দ্বিতলে শুইলেন স্বামী রাঘবানন্দ ও মনোরঞ্জন।

৩

শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। প্রভাত চারিটা। ঠাকুরঘরের পাশে 'নাট মন্দিরে' রাত্রিবাস করিয়াছেন একজন সাধু, বলাই ও সুখেন্দু। তাঁহারা এখন শয্যায়। গত রাত্রিতে অনেক দেরীতে শুইয়াছিলেন। শ্রীম অতি প্রত্যুষে দ্বিতল হইতে উপরে আসিয়াছেন। নাট মন্দিরে বিছানার পাশ দিয়া ছাদে যাইতেছেন কণ্ঠধ্বনি করিয়া। সাধু ও ভক্তরা লজ্জিত হইয়া হুড়মুড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আজ ১৫ই মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

শ্রীম দ্বিতলের ব্রিজে দাঁড়াইয়া আছেন, শরীর শীর্ণ। গলদেশে আধখানা লালপাড় বস্ত্র জড়ানো। একজন সাধু দ্বিতল হইতে তাঁহাকে দর্শন করিতেছেন। শ্রীম মনোরঞ্জনকে বলিতেছেন, লোহার কড়ির 'জঙ্গ' ছাড়িয়ে রং দেওয়াতে হবে। সাধুটি শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন আর ভাবিতেছেন — কি আশ্চর্য প্রায় অশীতিবর্ষীয় শ্রীম। কিন্তু brain কি active! মনের জোর অফুরন্ত! এত উপর নীচ করছেন। বাড়ি মেরামত হচেছ — তার খুঁটিনাটি সব ভাবছেন, দেখছেন। অবাধিত ব্রহ্মলীনতা আর কর্মতৎপরতা একসঙ্গে এই বৃদ্ধ বয়সে কি করে সম্ভব হয়? বিচিত্র জীবন অবতার পার্ষদগণের! এত বয়সেও কিরূপে 'মুক্তসঙ্গোঽহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমণ্বিতঃ' (গীতা ১৮-২৬)।

একটু পরেই শ্রীম নিজ মনে গান ধরিলেন —

গান। অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি।
আমি আর কি যমের ভয় রেখেছি॥
কালীনাম কল্পতরু হৃদয়ে রোপণ করেছি।
এই দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি॥
দেহের মধ্যে সুজন যে জন, তাঁর ঘরেতে ঘর করেছি॥
এবার শমন এলে, হৃদয় খুলে দেখাব ভেবে রেখেছি॥
সারাৎসার তারা নাম আপন শিখাগ্রে বেঁধেছি।
রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি॥

অন্তেবাসী প্রাতঃকৃত্য সমাপনের জন্য নিম্নতলে নামিতেছেন। শ্রীম-র কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফটকের ঘরে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট মনে শ্রীম-র গান শুনিতেছেন। শ্রীম-র মনপ্রাণ যেন শেষের চরণটির সহিত বিলীন হইয়া গেল — ‘রামপ্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি’। কি নিশ্চিন্ত আনন্দময় করুণ কণ্ঠস্বর! অন্তেবাসীর প্রাণ কম্পিত হইল। তিনি ব্যাকুলভাবে ভাবিতেছেন — হায়, তবে কি শ্রীম-র দিন ফুরিয়ে এল? আমাদের সৌভাগ্যের রবি কি অস্তমিতপ্রায়? (একুশ দিন পরেই শ্রীম মহাসমাধিমগ্ন)।

আবার গাহিলেন রামপ্রসাদী সঙ্গীতের কয়েকটি চরণ। মনকে ব্রহ্মশক্তি কালীতে লীন করিতেছেন।

গান। আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুমূলে রে চারিফল কুড়ায়ে পাবি॥
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
বিবেক নামে তাঁর বেটা, তত্বকথা তায় শুধাবি॥

অন্তেবাসী ভাবিতেছেন কম্পিত হৃদয়ে, শ্রীম আমাদের ছাড়িয়া ব্রহ্মপুরে চলিলেন। আমাদের জন্য রাখিয়া যাইতেছেন ‘নিবৃত্তি’ আর ‘বিবেক’। এই নয়নদ্বয় সহায়ে কি চলিতে বলিতেছেন আমাদের এই তমসাচছন্ন সংসারপথে?

ঠাকুরবাড়ির ছাদ। স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও হরি পর্বত বসিয়া আছেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেছেন, বর্তমান সময়ে কলিকাতাই তীর্থশ্রেষ্ঠ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ নরশরীরে অবতীর্ণ হইয়া এই স্থানেই সুদীর্ঘ ত্রিশ বৎসর অবতারলীলা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার শ্রীচরণ-রজঃসিঞ্চিত স্থানগুলি মহাতীর্থ, দর্শন করিলে হয় সবগুলি একে একে আবার।

হরি পর্বত স্বামীজীর কৃপাপ্রাপ্ত প্রাচীন ভক্ত। তিনি নিচে নামিয়া গেলেন। খানিকপর সংবাদ আসিল, শ্রীম তাঁহার সহিত কথা কহিতেছেন দ্বিতলে। অন্তেবাসী নামিয়া গেলেন। তিনি বারান্দায় বেঞ্চিতে বসিলেন হরি পর্বতের পাশে। শ্রীম নিজ কক্ষে খাটের উপর বসিয়া আছেন। জানালা দিয়া শ্রীম-র দর্শন ও কথা শ্রবণ করিতেছেন সাধু ভক্তগণ। অন্তেবাসীকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, পুষ্কর তীর্থের কথা হচেছ। ব্রহ্মা তপস্যা করেছিলেন ওখানে। এসব তীর্থস্থান সংসাররূপ জ্বলন্ত অনলে যেন oasis (মরুদ্যান)!

ভক্তগণ গিয়ে শান্তিলাভ করবে। তাই তিনি আগে থাকতে করে রেখেছেন, দক্ষিণেশ্বর, মঠ, কলিকাতা — এসব নূতন তীর্থ। আবার কামারপুকুর, জয়রামবাটি। সংযত চিত্তে এই সব তীর্থে কিছুদিন বাস করলে শান্তিলাভ হয়।

অন্তেবাসীর মন আজ ব্যাকুল। শ্রীম-র মুখ হইতে ‘দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি’ — সঙ্গীতের এই কলি শুনিবার পর হইতেই মন এই ভাবনায় মগ্ন। তাই শ্রীম-র কথায় মনোযোগ সামান্যই দিতে পারিলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ আসিয়া বেঞ্চিতে বসিলেন। নানারূপ কথোপকথন হইতেছে। ভারতীয় রাজন্যবর্গের ভক্তির কথা হইতেছে। স্বামী রাঘবানন্দ একজন ভক্তিমান রাজার কথা বলিলেন। হরিবাবু বলিলেন অপর একজন জয়পুরের রাজার ভক্তির কথা। অন্তেবাসী বলিলেন, বরদার বালক রাজা তাঁহার মায়ের সঙ্গে উটকামণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়াছিলেন একদিন ঠাকুরদর্শন আর সাধুদর্শন করিতে।

শ্রীম — তা, আসবেন না? দাঁড়ায় কোথায় মানুষ যদি সাধুদের না ধরে? সাধু হলেন ব্রিজ — মানুষ আর ভগবানের মাঝে। সাধুরা ভগবানকে ধরে রয়েছেন। মানুষ তাঁদের ধরে থাকলে সংসারে নির্ভয়ে চলতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে ভগবানের সঙ্গে সংযোগ না রাখলে শান্তি নেই। শান্তিহীন সুখ আর মায়া-মরীচিকা সমান। গীতায় ভগবান এই কথা স্পষ্ট করে বলেছেন, ‘ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্’ (গীতা ২-৬৬)। ঠাকুর তাই বলেছেন, ‘ভগবানের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে সংসারে থাক — যেমন পিতা মাতা।’ সাধুরা এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। কারণ তাঁদের সম্পর্ক ঈশ্বরের সঙ্গে অচেছদ্য। সাধু মানেই যে জগতের সম্পর্ক ছেড়ে ঈশ্বরের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে সংবদ্ধ। এদিকের মন ওদিকে নেওয়া। তারপর ছাদে উঠলে অর্থাৎ তাঁর দর্শন হলে দেখে তিনিই সব হয়ে রয়েছেন — তাই ‘ঈশাবাস্যমিদং সর্বং’। ঠাকুর স্বচক্ষে এই দৃশ্য সর্বদা দেখতেন। একদিন নয় — সর্বদা — সারাজীবন।

ঠাকুর নিজে বলেছেন, ‘এ শরীরে ভগবান অবতীর্ণ’। কতকগুলিকে আবার এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা তাঁকে ধরেই এই সংসারে রয়েছেন। এঁরাই সাধু, ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। তিনি এঁদের ঈশ্বর দর্শন করিয়ে

দিয়েছেন। এঁদের ধ'রে থাকলে আর ভয় নেই। এখানেও শান্তি সুখ আনন্দ, পরেও তাই। এই কথাই বলতে এসেছেন ঠাকুর। তাঁকে ধরে যাঁরা আছেন — তাঁরাই সাধু। আবার তাদের ধ'রে অপরে চলছে। এইরূপ যুগে যুগে হচেছ। যখনই ধর্মের গ্লানি হয় অমনি তিনি আবার এসে সাধু তৈরী করেন। এই প্রবাহ নিত্য। একদিকে জীবকে সংসারে বদ্ধ করেছেন তাঁর অবিদ্যাশক্তি দিয়ে, অপর দিক থেকে কতকগুলিকে মুক্ত করে দিচেছন সংসারবন্ধন থেকে তাঁর বিদ্যাশক্তি দিয়ে। অনন্তকাল চলেছে এই খেলা। মুক্তি সকলেরই হবে, আগে আর পরে। তবে মুক্তির পথ এই — সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা। এই দেশে লোক রাজ্য ছেড়ে সন্ন্যাসী হয় তাই।

স্বামী রাঘবানন্দ — হাঁ, এদেশেই এ সম্ভব। ওদেশে (ওয়েস্ট) Medieval Age-এরও (মধ্যযুগের) অমন সব কথা শোনা যায়।

শ্রীম — হাঁ। ওদেশেও hero-worship (বীরপূজা) আছে। শেষে এটাই অবতারপূজায় দাঁড়ায়। এদেশে এটা সর্বত্র, সর্বদা। অবতারের সকল আচরণ অমূল্য। চৈতন্যদেবের কথায় শোনা যায়, ভাবে তিনি হাত পা ছুঁড়ছেন। ভক্তরা পা ধরে ফেলতেন (হাতে দেখাইয়া) এমন করে। একে ওঁরা বলতেন প্রহার প্রসাদ (হাস্য)।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ। চৈতন্যদেবের মন মহাকারণে লীন হতো। তাকে বলে মহাভাব। তখন দেশ কাল, অর্থাৎ জগতের জ্ঞান অন্তর্হিত হতো। জড়বৎ পড়ে থাকতেন। ঠাকুরের এই অবস্থা হয়েছিল। ব্রাহ্মণী এসে চিনেছিলেন। এর নিচের অবস্থা, ভাব। তখন ভক্তি ঘনীভূত হয়েছে। তখনই হাত পা ছুঁড়তেন। এর নিচে সূক্ষ্মাবস্থা। এতে নাম-সংকীর্তন, ঈশ্বরীয় গুণগান, কীর্তন, এসব চলে। স্থূল তার নিচে। অবতারে স্থূলদৃষ্টি নেই।

হরি পর্বত — শুনেছি ভগবানদাস বাবাজী ঠাকুরকে চৈতন্যদেব বলে চিনেছিলেন। কলুটোলায় চৈতন্যসভায় চৈতন্যদেবের আসনে ঠাকুর ভাবে বসেছিলেন। একথা শুনে বাবাজী প্রথমে খুব ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রীম — অবতারলীলায় এরূপ হয়। পরে চিনতে পারে বহিরঙ্গ ভক্তগণ। অন্তরঙ্গগণকে পূর্বে চিনিয়ে দেন। ভগবানদাস বাবাজী পরে কত ভক্তি করলেন ঠাকুরকে, তাঁর আশ্রমে যখন গিছলেন। ঐ স্থানটি

কুলটোলায় আর বের করতে পারলেন না। একবার তো আপনি আমাদের নিয়ে গিছলেন। রাস্তা ঘাট সব বদল হয়ে গেছে। জোড়াসাঁকোর হরিসভার স্থানটিও বের হলো না। নূতন শহর হয়ে গেছে।

৪

হরি পর্বত — দেবীসূক্তে পড়ি, 'অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে'। এটার অর্থ বুঝতে পারি না।

স্বামী রাঘবানন্দ — 'সমুদ্রে' অর্থ করেন টীকাকাররা 'পরমাত্মায়'। 'অপ্‌সু' মানে জলে, বুদ্ধিবৃত্তিতে, 'অন্তঃ' মানে ভিতরে, মধ্যে। বুদ্ধিবৃত্তির মধ্যস্থিত যে পরমাত্মা, ব্রহ্মচৈতন্য —তা-ই আমার উৎপত্তিস্থল, অর্থাৎ কারণরূপ।

শ্রীম — এই মন্ত্রের direct (সহজ) অর্থ নেওয়াই মনে হয় ভাল। বাক্‌দেবী আত্মসাক্ষাৎকার করে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করেন। বড় বড় কতকগুলি বস্তু ও ব্যক্তির সঙ্গে একাত্মভাব প্রকাশ করে এই মন্ত্র বলছেন। নিজের জন্মদাতা পিতার সঙ্গে একাত্মভাব প্রকাশ করছেন — 'অহং সুবে পিতরং'— আমি পিতাকে প্রসব করেছি, এই বাক্যে। 'অহং অস্য মূর্দ্ধন' — আমি এই জন্মদাতার, পিতারও 'মূর্দ্ধন' — মানে মস্তকে, উপরে। লৌকিক দৃষ্টিতে পিতাই থাকেন উপরে, মানে পূজনীয়রূপে। কিন্তু পরমব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাবার পর দেখেছেন দেহধারী পিতারও কারণ তিনি। অতএব, পূজ্য পিতারও পিতা তিনি। আর 'মম যোনিঃ', নিজের অধিষ্ঠান বা উৎপত্তিস্থল বলেছেন 'অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে'। সমুদ্রে, জলের ভিতরে। অর্থাৎ অতি গভীর স্থানে, লৌকিক দৃষ্টির বাইরে অতিশয় গুহ্য স্থানে। শাস্ত্রে 'গুহাহিতং', 'গুহায়াং' — এসব কথা দিয়ে ব্রহ্মচৈতন্যের নির্দেশ আছ। ব্রহ্মচৈতন্যই আমি।

পিতার দেহ লক্ষ্য করে, আর নিজের আত্মস্বরূপ লক্ষ্য করে এই উক্তি। পরের মন্ত্রাংশের সঙ্গেও সঙ্গতি থাকে এই ভাবে। আমি সমস্ত বিশ্বের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রয়েছি অন্তর্যামী রূপে। বৃহদারণ্যকের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণের সঙ্গে এর সঙ্গতি রয়েছে। দেবীসূক্তের এই অংশের সঙ্গে আমি সমগ্র বিশ্বের অন্তর্যামী — 'ততো বিশ্বা ভুবনা অনুবিতিষ্ঠে'। এতে ভিতরের

দিকের একাত্মভাব দেখান হয়েছে। এখন বাইরেও 'আমিই' সর্বব্যাপী, এটাই দেখাচেছন। 'উত অমুং দ্যাম্' আর ঐ স্বর্গ, আমি 'বর্ষ্মনা উপস্পৃশামি' — শরীর দিয়ে স্পর্শ করে আছি। অর্থাৎ চতুর্দশ ভুবন ব্যাপ্ত হয়ে আছি। এই বিশ্বের অন্তরেও আমি বাহিরেও আমি।

সৃষ্টির আদিতে পরমাত্মা। সৃষ্টির পর সর্বভূতের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে পরমাত্মা। আবার সকল সৃষ্ট পদার্থেও পরমাত্মা।

'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ', 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' — এসব কথার সঙ্গেও মিল রয়েছে।

ঠাকুরও বলেছেন, অন্তরে বাহিরে, মা। আমি দেখছি, বিচার করবো কি? 'Before Abraham was I am' — এব্রাহামের জন্মের পূর্বেও আমি থাকব, বাইবেলে আছে।

একজন সাধু — এই ব্রহ্মাত্মকতা কি সর্বদা থাকে?

শ্রীম — এসব তো intellectual (বোধগম্য) বিষয় নয়। ঠাকুর বলতেন, 'মা দেখিয়ে দিয়েছেন এসব'। বলতেন, 'আগে এ চক্ষে সব দেখতাম, এখন ভাবে দেখি'। এতেই বোঝা যায় সর্বদা intensity (ভাবের গভীরতা) আসে না। মন যেন নৌকোর বাচ খেলা। ঠাকুরের দেখা যেতো — এই পরমব্রহ্মে লীন, আবার ভক্তদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছেন — যেন সাততলা থেকে একতলায় নেমে এলেন।

একজন সাধু — ব্রহ্মজ্ঞানে তো সকলেরই সমান অধিকার — স্ত্রী-পুরুষের?

শ্রীম — হাঁ। তবে ঠাকুর বলতেন, স্ত্রীলোকদের প্রায় জ্ঞান হয় না। বিদ্যাশক্তিদের হয়। সে খুব অল্প, আঙ্গুলে গোনা যায়।

জগৎটা তো রাখতে হবে! মা না থাকলে জগৎ চলে না। তাই স্ত্রীতে জ্ঞান কম — অজ্ঞান, মায়া, স্নেহ, মমতা বেশী। নইলে জগৎ পালন করবে কে? কখন কখন তিনি দু'চার জনকে এর ভেতর থেকে বের করে নেন। এই দেবীসূক্তের দ্রষ্ট্রী বাক্‌দেবী যেমন। আরও কত হয়েছে, হচেছ, হবে। ওদেশেও (ওয়েস্টে) জ্ঞানী হয়েছে এমনতর স্ত্রীলোক আছে।

স্বামী রাঘবানন্দ — শাস্ত্রে 'কারণসলিলের' কথা আছে। ওটা কি?

শ্রীম শুনিতে ভুল করিয়াছেন। তাই তিনি কারণশরীরের ব্যাখ্যা

করিতেছেন।

শ্রীম — শরীর, অর্থাৎ এখনও differentiation (ভেদ ভাব) ভেতরে আছে। (বেদান্তবাদী সন্ন্যাসীদের ভাব আরোপ করিয়া) আমাদের মনে কর ‘নেতি নেতি’ মার্গ। আমরা ‘নেই’ বললেই তো আর ‘নেই’ হয়ে গেল না।

ঠাকুর যা দেখেছেন তাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, কারণ, মহাকারণ, এসব আছে। মহাকারণ যেখানে সব বিরাম — ‘নেতি নেতি যথা বিরাম’।

স্বামী রাঘবানন্দ — কারণশরীর নয় ‘কারণসলিল’।

শ্রীম — ঐ যে পুরাণে আছে, সৃষ্টির সময় সব জলময় ছিল।

স্বামী রাঘবানন্দ — এটা symbolical (প্রতীকমূলক)। কিন্তু কিসের, তা বোঝা গেল না। ঠাকুর নাকি দেখেছিলেন মা-কালীর ঘরে ঐরূপ জল ঢেউ খেলছে।

শ্রীম — জলরাশিকে কেউ কেউ বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করেন। পরমাত্মা-সমুদ্রে বুদ্ধিরূপ জলরাশি।

পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট — এই চারটে অবস্থা। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর মায়াযুক্ত হন। তারপর সৃষ্টির সকল জ্ঞান এসে যায়। বুদ্ধিরাশি, সমষ্টিবুদ্ধির সমাবেশ হয়। তারপর স্থূল জগতের কারণ বিরাটের সৃষ্টি। এই থার্ড stage-কে লক্ষ্য করে একথা বলতে পারেন — ‘কারণসলিল’।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — ঠাকুরের কি দৃষ্টি! একদিন বললেন, সব দেখছি মড়া — এই সারা জগৎটা। আমি তার ভিতরে বসে আছি। ‘মৃত্যুঃ সর্বহরং চাহং’ — গীতায় আছে (১০-৩৪)। যা সৃষ্ট তাই মরণধর্মী। কেবল ভগবানই অমর।

আমাদের কি করে রেখেছেন, দেখ না! এই রাত্রি, অনন্ত starry sky (নক্ষত্রখচিত আকাশ)! কি grand mystery (চমৎকার প্রহেলিকা)! দেখছি তো! ভাবছি, এ তো রোজই হচেছ। কে করেছেন এ সব, কেন করেছেন — এ ভাবনা নেই। ও মা, সব যে ভুলিয়ে দিচেছন মহামায়া! (আকাশে লক্ষ্য করে) দেখ না, ঐ আকাশ অনন্ত।

একজন ভক্ত — ভক্তরা এই বিরাটের চিন্তা করে নিজের ক্ষুদ্র অহঙ্কারকে ঈশ্বরের দাস বলে মনে করে।

শ্রীম — আর একদিন ঠাকুর বললেন, এই বিশ্বটা একটা শালগ্রাম।

আর তোমার চক্ষু দু'টি তাঁর চক্ষু। তার ভেতর দিয়ে সব দেখছি।

স্বামী রাঘবানন্দ — এর অর্থ কি?

শ্রীম — এর অর্থ, শালগ্রামের ভেতর থেকে সব আসছে। শালগ্রাম তো তাঁরই একটি বিশেষ রূপ।

ঠাকুরের কি সব অবস্থা হতো। কখন কচের কথা দিয়ে নিজের অবস্থা বোঝাতেন। কচ সমাধিস্থ। নিচে মন এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কি দেখছো? তিনি বললেন, সব ব্রহ্ম দেখছি, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। ঠাকুরও নিচে নেমে এসে বলতেন, দেখছি তিনিই সব হয়ে রয়েছেন, মা।

একজন ভক্ত — ঠাকুর দেখেছিলেন সবই মোম দিয়ে ঢাকা — মোমের বাগান, গাছপালা বাড়িঘর, মানুষ — সব মোম দিয়ে তৈরী।

শ্রীম — হাঁ, মোম মানে ব্রহ্মচৈতন্য, সচিচদানন্দ। চৈতন্যদেবের অমন যে শরীর, তাও ভুল হয়ে যেতো ঐ অবস্থায়! কতখানি ভালবাসা হলে ভগবানের জন্য, ওরূপ হয় — শরীর ভুল হয়ে যায়! কখনও সমুদ্রে পড়ছেন, কখনও ভাবে রাস্তায় পড়ে আছেন, দেহের জ্ঞান নেই।

একজন ভক্ত — দেহ ভুল হলেই সংসার ভুল হয়। তখন ঐ অবস্থা, ব্রহ্মলীনতা।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ঐ অবস্থায় শরীর একুশ দিন থাকে। তাই শরীর রাখবেন বলে মন নিচে নামিয়ে আনতেন। সকলে ফিরে আসতে পারে না।

৫

জিতেন্দ্রনাথ সেনের প্রবেশ। ভক্তরা তাঁহাকে বড় জিতেনবাবু বলেন। অন্তেবাসী বেঞ্চি ছাড়িয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন। উনি নিজে শ্রীম-র ক্ষুদ্র কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঘরের পিঁড়ায় বসিলেন। শ্রীম বলিলেন, ওখানে না। নিচে আসন পেতে বসো! এই আসন।

শ্রীম (বড় জিতেনের প্রতি) — আপনাদের বাড়িতে ছেলেদের পৈতে হল?

বড় জিতেন — আজ্ঞে হাঁ। দু'জনের হল। আর তিনটি বাকী। এদের একজন অষ্টম গর্ভের। ওদের মা বলছেন — না, অন্য দু'ভাই আসুক,

তবে হবে। ঘটা করে কান ফুঁড়ে দেব।

শ্রীম — যেমন ঘটা করে চিকিৎসা, ঠাকুর বলতেন। (সহাস্যে) মেয়েদের ওসব না হলে ভাল লাগে না। লোকজন আসবে। ঢাক ঢোল পিটবে। খাওয়ান দাওয়ান, এসব হবে। পরে ঐ গল্প করবে পৈতেতে পাঁচশ' লোক খাওয়ান হল।

অরুণ (শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র) — আমার কাছে একদিন গায়ত্রীর অর্থ জানতো এলো। আমি বললাম, হাঁ বলবো। তবে তিনদিন আলুভাতে ভাত, আর গাওয়া ঘি, আর দুধ খেয়ে এসো। তারপর বলবো। আরও সাতদিন করো, (হাস্য) তবে আমি অর্থ বলবো। (সকলের হাস্য)।

(সকলের প্রতি) গায়ত্রী নেওয়ার যখন বিধান আছে তখন নেওয়া ভাল। (একজন সাধুর প্রতি) গায়ত্রী সকালে কুমারী, দুপুরে যুবতী সাবিত্রী, আর সন্ধ্যায় বৃদ্ধা কি?

এবার অন্য কথা হইতেছে।

বড় জিতেন — এবার পেনসন্ নেবো, আর দুই তিন মাস পর।

শ্রীম — কেন? Extension (কর্মকাল বৃদ্ধি) নেবেন না? অমৃতবাবুও নাকি নেবেন শুনছি।

বড় জিতেন — না, আমার নিতে ইচেছ হচেছ না।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — মুর্গী খাই না। কেন, না পাই না। (উচচহাস্য)।

বড় জিতেন — বড় সংসার। কেউই ছেলেরা লায়েক হয় নি। ভাইটিও চলে গেল। তাই অভাব।

শ্রীম — অভাবের কিন্তু শেষ নেই। এ নিজের সৃষ্টি। স্বামী বিবেকানন্দকে ঠাকুর বলেছিলেন — ডাল ভাত হতে পারে। ধরেছিলেন কি না মাকে (জগদম্বাকে) বলে দিতে বাড়ির লোকদের খাওয়া পরার ব্যবস্থার জন্যে। দু'চার দিন পরে এসে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো? তখন ঠাকুর বললেন, 'বলেছিলাম। মা বললেন, ডাল ভাত পর্যন্ত হতে পারে। এর বেশি হয় না।'

'এর বেশী হয় না' — এর অর্থ কি, না শরীরধারণের জন্য যতটুকু নেহাৎ দরকার তাই হবে। এর বেশী না।

ঠাকুর বলতেন — life simple (জীবনযাত্রা সরল) না করলে

ধর্মজীবনযাপন হয়না। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য তাঁকে ডাকা। তার সময় হয় না যদি life simple (জীবনযাত্রা সরল) না হয়।

মানুষ নানান্‌খানাতে জড়িয়ে অভাবের সৃষ্টি করে, আর উদ্দেশ্য ভুলে যায়। 'সমাধৌ ন বিধীয়তে।' (অন্তেবাসীর প্রতি) 'যামিমাং' — কি আছে?

অন্তেবাসী — যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ॥ (গীতা ২-৪২)
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্‌।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ (২-৪৩)
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ (২-৪৪)

শ্রীম — 'স্বর্গপরা' অর্থাৎ স্বর্গাদি ভোগের জন্য কর্ম করে। আর তাতেই জড়িত হয়ে যায়, আর উদ্দেশ্যের ভুল হয়ে যায়। ঈশ্বরদর্শন উদ্দেশ্য। হরি মহারাজ বলেছিলেন, হচে্‌ছ না কেন? অমনি ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তুমি জান তুমি কে?' তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। তুমি আবার কে? যদি কর্ম প্রকৃতিতে থাকে, তবে নিষ্কামভাবে ঐ কর্ম কর। তাহলে এতে বন্ধন আসবে না। তাঁকে লাভ করতে পারবে — 'ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি' (গীতা ২-৩৮)।

কেউ সত্ত্ব, কেউ রজঃ কেউ তমতে আবদ্ধ। ব্রহ্মা সৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত। ঋষিরা — সনক, সনন্দ, সনৎকুমার, সনাতন তাঁর কাছে গেলেন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশের জন্য। তাঁদের দেখে ব্রহ্মা বললেন, এ সময় আমি কর্মে ব্যাপৃত আছি। তোমরা বসো। তাঁদের সামনেই ধ্যান করতে লাগলেন চক্ষু বুজে। একেবারে সমাধিস্থ। তখন হংসশরীর ধারণ করে এসে তাঁদের উপদেশ করলেন। এই থেকে হংস-উপনিষদের জন্ম।

বিষয়চিন্তা করলে তাঁকে ভুলিয়ে দেয়। বিষয় মানে, এইসব — বাড়িঘর, স্ত্রীপুত্র। আবার রূপ রস গন্ধাদি। এই দুই ত্যাগ হলে তবে তিনি দেখা দেন।

বড় জিতেন (হতাশভাবে) — আর মশায় হচে্‌ছ না। এখন আপনারই ভরসা। বিষয় মনের গোড়ায় ঢুকে রয়েছে।

শ্রীম (ভরসা দিয়া) — না, হবে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় তিনিই করছেন।

তিনিই আবার গুরুরূপে এসে বলে গেছেন, 'তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না। শুধু এই ভাবলেই হবে, আমি কে আর তোমরা কে। ব্যস্। তারপর একটা সম্বন্ধ করে আমার সঙ্গে থাক — দাস, সেবক কি সন্তান।' যদি তাঁর সন্তান মনে করা যায়, তবে তাঁর মত চলতে চেষ্টা করবে।

বড় জিতেন (দুঃখ করিয়া) — 'আমি'-টা গেলে হয়।

শ্রীম (সস্নেহে) — কেন, 'আমি'-টা রেখে দিয়েছেন? না, তবে সৃষ্টি হবে। তাই তো তিনি বললেন।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — আমার ভাব — আমি নাবালক সন্তান। তিনি পিতা, সব ভার নেবেন।

শ্রীম — শ্রীবাসকে চৈতন্যদেব বললেন — শ্রীবাস, তুমি কার চিন্তা করছো? শ্রীবাস ধ্যান করছিলেন দেখে ঐ কথা বললেন। অর্থাৎ, তুমি যার চিন্তা করছো সেই 'আমিই' তোমার সামনে এসে উপস্থিত। তবে আর কার চিন্তা করছো?

একজন সাধু (স্বগতঃ) — ঠাকুর শ্রীমকে চৈতন্যের দলে দেখেছিলেন। শ্রীম কি শ্রীবাস? উভয়েই পণ্ডিত ও গৃহস্থাশ্রমী। আবার কেহ কেহ বলেন — মুরারী গুপ্ত। শ্রীম ও মুরারী গুপ্ত, উভয়েই শ্রীভগবানের অমৃতবাণীর রক্ষক।

শ্রীম — আবার তিনিই সব করছেন। আবার যুগে যুগে অবতীর্ণ হচেছন। হয়ে তাঁর message (মহাবাণী) দিয়ে যাচেছন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪-৭/৮)

যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখনই আসেন। এসে সব message (উপদেশ) দেন। আবার গ্লানি হয়। আবার আসেন। এইভাবে যুগে যুগে আসেন। গ্লানি হয় কেন? তা না হলে যে আবার আসবার পথ হয় না, তাই।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — কিছুই করতে হবে না। কেবল তাঁকে চিন্তা করা। কি করবে তোমার চিন্তাদ্বারা? কেবল প্রার্থনা — এই উপায়।

যদি বল, তা হলে কিছুই করবার নেই? তার উত্তর, তিনি যদি চেষ্টা

দিয়ে করিয়ে নেন। তা তাঁর কাজ। তোমার দ্বারা নয়। তোমার কি সাধ্য? তুমি তাঁকে ধর। চেষ্টাও তাঁরই। সত্ত্ব রজঃ তমঃ, এই তিন গুণে সব আসক্তি। কেউ রজঃতে, কেউ তমেতে। তাই তাঁকে ভুলে যায়। এই সবই বিষয়ের অন্তর্গত।

তিনি অবতীর্ণ হয়ে বলেছেন, 'আমাকে ধর, ভয় নেই'। দেখ কি রকম কাণ্ড! তিনি এসে কথা ক'ন।

শ্রীম কিছুক্ষণ নীরব।

বড় জিতেন — আহারটা বড্ড কমিয়ে দিয়েছেন শুনছি। এক পয়সার রুটি তরকারী রাতে। দুপুরে দেড় ছটাক চালের ভাত। আধ ছটাক ডালসিদ্ধ একটু হলুদ দিয়ে, আর দু'টি পটল, দুধ।

শ্রীম (কথাপ্রসঙ্গ উল্টাইয়া দিয়া) — কাল বেদনা কত! ওমা 'কথামৃত' লিখছিলাম, সব ভুলে গেলাম। যেমন মাছটা মরমর, জলে পড়তেই সোঁ করে ছুটে পালাল।

স্বামী রাঘবানন্দ — নিজের element-এ থাকলে ঐরকম হয়।

শ্রীম — তাই বলে, 'For man shall not live by bread alone' (অন্নই বেঁচে থাকার একমাত্র উপকরণ নয়)।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — ব্যস্, শ্রীম বলছেন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারলে আর কিছু চিন্তার দরকার হয় না। সংসার বলে তাদের পাগল, মূর্খ। বস্তুতঃ তারাই পণ্ডিত।

হরি পর্বত প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন।

স্বামী রাঘবানন্দ (শ্রীম-র প্রতি) — চিঁড়েটা ভিজান আছে, খেয়ে নিলে হয়।

শ্রীম চিঁড়া খাইতে নিচে নামিলেন বিছানা হইতে।

অন্তেবাসী — Double strain (দ্বিগুণ পরিশ্রম) হয় না যদি লেখাটা অন্যে করে।

শ্রীম — হাঁ, যখন আমার সুবিধা, তখন অন্যের হয় না। অন্যের সুবিধার সময় আমার সুবিধা হয় না।

স্বামী রাঘবানন্দ — কেন, আপনি আমাকে ডাকবেন। এ তো আমার সৌভাগ্য! মনে থাকবে, আমি এই বই (কথামৃত) লিখেছিলাম।

শ্রীম ঘরে চিঁড়া খাইতেছেন।

৬

ঠাকুরবাড়ির দ্বিতলের বারান্দায় একটি বেঞ্চিতে উপবিষ্ট স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, পূর্বাস্য। সামনের বেঞ্চিতে বসা বড় জিতেন, মনোরঞ্জন ও সুখেন্দু।

বড় জিতেন — জগবন্ধু, তোমাকে খাওয়াতে ইচেছ করছে। কি খাবে বল। (স্বামী রাঘবানন্দের প্রতি) এঁদের দেখলে খাওয়াতে ইচেছ হয়। এঁরা সব কি হয়ে গেছেন! এমন একটি অবস্থা হয়েছিল, তখন জগবন্ধুকে বললাম এ কর, নয় ত ও কর। বলছে, কিছুই ভাল লাগছে না, জিতেনবাবু। যেন পাখিটা উড়ে উড়ে tired (ক্লান্ত)। তারপর মঠে গিয়ে শান্ত। মাস্তুল পাওয়া গেল।

বড় জিতেন মনোরঞ্জনকে টাকা দিলেন, বড় রসগোল্লা আর ল্যাংড়া আম আনিতে।

সকাল আটটা। চিঁড়া খাইয়া শ্রীম ঘর হইতে বাহির হইতেছেন দক্ষিণমুখী দরজা দিয়া, কথা কহিতে কহিতে।

শ্রীম — ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ উপদেশ ... life simplify (জীবনযাত্রা সরল) করতে হবে। এই হলো তাঁর সব চাইতে বড় কথা।

শ্রীম বারান্দায় বড় জিতেনের সঙ্গে বেঞ্চিতে বসিলেন দক্ষিণ প্রান্তে, পশ্চিমাস্য। তাঁহার সম্মুখে সাধুগণ।

শ্রীম — কি সব কথা হচিছল?

বড় জিতেন — জগবন্ধুকে খাওয়াতে ইচেছ হয়েছে। এখানে থেকে থেকে এরা সব কি হয়ে গেল।

শ্রীম — কি বললেন? খাওয়াবেন? বলুন, প্রসাদ খাওয়াবেন। 'জগবন্ধু' — তা, ঠিক। জগবন্ধু মানে ঈশ্বর।

বড় জিতেন (যুক্তকরে) — মশায়, মাফ করুন। ভাষায় গোলমাল।

শ্রীম (সহাস্যে) — তাই 'স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব' (গীতা ৪-৫৪)।

মনোরঞ্জন আম ও রসগোল্লা আনিয়াছেন। শ্রীম তিনতলায় ঠাকুরঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীম (স্বগতঃ) — কিন্তু ঠাকুরের প্রধান উপদেশ plain living and high thinking. Life simple (সরল জীবন, উন্নত মনন। জীবনযাত্রা সরল) করা, নইলে ধর্মজীবন যাপন হয় না।

'পারি না', 'কি করে হয়', 'বড়ই কঠিন' — এর উত্তর হল, অভ্যাস করতে হয়! Repetition, repetition-এর (অভ্যাস, অভ্যাসের) দরকার।

অর্জুনকে বলেছিলেন দু'টি কথা, — 'অভ্যাস' আর 'বৈরাগ্য'। অভ্যাসের বড়ই দরকার। আমি এটা করবো, ওটা করবো না — এ বলবার যো নেই। তোমার প্রকৃতি তোমায় করাবে। 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। তবে উপায় আছে। ভক্তদের কল্যাণের জন্য শিখিয়েছিলেন কালীঘরের সামনে চাতালে নিয়ে (শ্রীমকে)। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'। প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'। ভক্তদের কল্যাণের জন্য তিনি এই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — ঠাকুর, এখন যেমন করিয়ে নিচ্ছ সর্বদাই তা যেন মনে থাকে।

শ্রীম — এই প্রার্থনা repetition (জপ) করতে হয় সর্বদা — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' নিজে শিখিয়ে দিচেছন, lead (পরিচালনা) করছেন।

'এই দেখ আমি খাচিছ', ব্রাহ্মণী বলেছিলেন ঠাকুরকে। মড়ার মাংস। 'এই আমি খাচিছ' (হাস্য)! এসব অতি গুহ্য কথা, বলতে নেই। তন্ত্রের সাধনের সময় ব্রাহ্মণী lead (পরিচালনা) করছেন নিজে খেয়ে।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখ, প্রথমে বললেন, 'প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষতি'। আবার বলছেন, 'সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ' (গীতা ১৮-৬৬)।

'মা শুচঃ' বলছেন, তুমি ভেবো না প্রকৃতি জয়ের পথ দেখাবেন।

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — আমি দেখেছি, প্রকৃতি যখন প্রবল হয় তখন তাঁর শরণাগত হলে সুফল ফলে। আর কি আশ্চর্য! সাত বছর বয়সে

গীতা ও চণ্ডীকে পবিত্র মনে করতাম। দশ বছরের সময় গীতার শ্লোক মুখস্থ আরম্ভ করি। আরও মনে আছে, ‘চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ’ — এই একটি আর তার উত্তর ‘অভ্যাসেন তু’। আর ‘যো মাং পশ্যতি সর্বত্র’। এখন এইগুলিই আমার সাধন। ঈশ্বরই অন্তর্যামীরূপে এটা করিয়েছেন। তিনি সর্বদা সঙ্গে, তবে ভয় কি?

শ্রীম (স্বগতঃ) — Our Father which art in heaven,
Hallowed be Thy name.
Thy kingdom come. Thy will be done
in earth, as it is in heaven.
Give us this day our daily bread.
And forgive us our debts, as
we forgive our debtors.
And lead us not into temptation, but
deliver us from evil. For Thine is the
Kingdom, and the Power, and the Glory,
for ever, Amen.

শ্রীম — 'Lead us not into temptation' — ঐ, ‘মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।’

একজন ভক্ত (স্বগতঃ) — শ্রীম-র বয়স প্রায় আশী। কত কাজ করেন। কিন্তু কি অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি ও মেধা! কি সুন্দর comparative (তুলনামূলক) চিন্তা! তাই মহাপুরুষ। আগে আমাদেরও হতো। এখন

হে স্বর্গনিবাসী জগৎপিতা, তোমার নাম মহিমামণ্ডিত হউক।
এই বিশ্বে তোমার ধর্মরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হউক।
স্বর্গের ন্যায় এই ধরাধামে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।
তোমার কৃপায় যেন আমরা প্রতিদিন আহারপ্রাপ্ত হই।
হে পিতঃ; মানুষ যেমন মানুষের অপরাধ মার্জনা করে,
তুমিও সেইরূপ আমাদের সকল অপরাধ মার্জনা কর।
তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমাদের মুগ্ধ করো না প্রভো,
আর সকল অশুভের হাত থেকে সদা রক্ষা কর।
পিতঃ, তুমি বিশ্বের অধিপতি, তুমি সর্বশক্তিমান, তুমি মহামহিম।
ওঁ শান্তি।

আর ওরকম হয় না।

শ্রীম — ভক্তদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন ঠাকুর, ‘মা, এদের তুমি এক একবার দেখা দিও মা। নইলে কেমন করে সংসারে থাকবে মা।’

বড় জিতেন (খেদের সহিত) — তাতো হলো। ‘তুমি মাতা থাকতে আমার জাগা ঘরে চুরি।’ — তার কি হবে?

শ্রীম (সহাস্যে) — তাইতো সর্বদা ওই প্রার্থনার কথা বলেছেন। আর কি আছে — ‘কালী নামে দাও রে বেড়া’।

বড় জিতেন — ‘ফসল তছরূপ হবে না।’

শ্রীম (গান গাহিয়া) — মন রে কৃষিকাজ জান না।

এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোনা॥
কালী নামে দাও রে বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁষে না॥
অদ্য কিংবা শতাব্দান্তে, বাজাপ্ত হবে জান না।
এখন আপন একতারে, মন রে, চুটিয়ে ফসল কেটে নে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপণ করে, ভক্তিবারি সেঁচে দে না।
একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না॥

শ্রীম (সকলের প্রতি) — গুরু যা বলেছেন পালন করতে হয়। মন্ত্র নিলাম — ওমা, আর কিছু নেই? সব হয়ে গেল? একমাস অন্ততঃ কর পালন।

বড় জিতেন — এইবার retire (অবসর গ্রহণ) করবো। কোথায় থাকলে ভাল হবে?

একজন সাধু — কেন, কাশীতে থাকবেন।

বড় জিতেন — এখানকার মত কি কাশী! এখানে যে সব আছে!

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, এক পোয়া দূরে একটু ভজনের জায়গা করতে হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — এক পোয়া কি quarter of a mile (সিকি মাইল)?

শ্রীম — না, Half a mile (অর্ধ মাইল)।

বড় জিতেন — তীর্থে ফীর্থে কী হবে? এমন সব রয়েছেন। আপনি আছেন। এখানকার মত স্থান কোথায়?

শ্রীম — এইখানে (ঠাকুরবাড়িতে) ঠাকুর রয়েছেন। তা যদি এখানেই সাধন করে কেউ, তাঁকে দেখতে পারে। তাহলেই এই তীর্থ। তবে যদি সর্বত্যাগী ডাকেন তবে হয়। যেখানে অনেক লোক তাঁকে দর্শন করেছেন, কেউ দর্শনের জন্য ডাকছেন, তাকেই বলে তীর্থ।

স্বামী রাঘবানন্দ — আমরা কিন্তু একটা স্থানে স্থির হয়ে বসতে পারলে বাঁচি। সর্বদাই মন যেতে চাইছে।

শ্রীম ও স্বামী রাঘবানন্দ (একসঙ্গে) — আবার আলস্য এরূপ হয় নড়তে চায় না (শ্রীম-র হাস্য)।

বড় জিতেন (করজোড়ে) — বলুন, আমার হোক।

বড় জিতেনের হৃদয়ে অপূর্ব বিশ্বাস! শ্রীম বলিলেই তাঁহার শান্তিলাভ হইবে।

বড় জিতেন প্রদত্ত আম ও রসগোল্লা ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া মনোরঞ্জন দোতলায় লইয়া আসিয়াছেন।

শ্রীম (মনোরঞ্জনের প্রতি) — দিন, হাতেই দিন। জগবন্ধুকে আগে দিন। এ বড় আমটা আগে দিন।

জগবন্ধু (স্বামী রাঘবানন্দকে দেখাইয়া) — এঁকে দিন।

শ্রীম — না, তুমি ন্যাও।

জগবন্ধু (মনোরঞ্জনের প্রতি) — এঁকে দিন।

শ্রীম (দুঃখিত হইয়া) — ফ্রেণ্ডদের কথা শুনতে হয়। বুড়োদের কথা শুনতে হয়। 'বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যম্'।

স্বামী রাঘবানন্দ আমটা হাতে লইয়া জগবন্ধুর হাতে দিলেন। জগবন্ধুর তখন চৈতন্য হইল। লৌকিকতার অনেক ঊর্ধ্বে শ্রীম-র দৃষ্টি। বড় জিতেনের আন্তরিক ইচছা জগবন্ধুকে খাওয়ান। শ্রীম তাই তাঁহাকে উহা আগে দিতে বলিলেন। মহাপুরুষদের আদেশের উপরও নিজের লৌকিকতাকে স্থান দিয়াছেন বলিয়া জগবন্ধু মর্মাহত। তিনি ভাবিতেছেন, 'স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত' (গীতা ২-৫৪) — এই মহাবাক্য আমি পালন করতে পারলাম না।

সাধুরা আম খাইতেছেন। জগবন্ধুর হাত হইতে রসগোল্লার রস মেঝেতে পড়িতেছে। তিনি উহাতে চঞ্চল হইয়াছেন। শ্রীম তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন, ও আমরা করে নেব।

সকলের হাতেই আম ও রসগোল্লা।

শ্রীম (সহাস্যে) — যিনি বাঁটেন তাঁকে কেউ বলে না, তুমি নাও। তাই পাণ্ডারা খুব হুঁশিয়ার। যদি কেউ ভোগ দেয়, নিজের ভাগটা আগে রেখে তারপর তাকে প্রসাদ দেয়।

বড় জিতেনবাবুর একটি ছেলে আসিয়াছে শ্রীমকে প্রণাম করিতে। শ্রীম সাধুদের দেখাইয়া বলিলেন — এঁদের প্রণাম করো। কল্যাণ হবে। ছেলে প্রণাম করিল।

বড় জিতেনবাবুর ছেলেরা কেহ কেহ লায়েক হইয়াছে, কিন্তু কেহই কোন কর্ম করে না এখনও। এই বিষয় লক্ষ্য করিয়া কথা বলিতেছেন শ্রীম।

শ্রীম (জনান্তিকে) — মা একজনকে বলেছিলেন, ছেলেরা কুলি খেটে খাক্ না — ঘরে বসে বসে খাচেছ দেখে। বলেছিলেন, তুমি কেন ভগবানের পথ থেকে বিচলিত হবে এদের খাওয়ানোর জন্য? বড় হয়েছে, এখন কাজ করুক। নয়তো কুলি খেটে খাক্। (হাস্য)। (ছেলের প্রতি) কি বল তুমি?

ছেলে — তা হলে যে সকলেই কুলি হয়ে যাবে।

শ্রীম (হো হো হাস্যে) — সকলেই কুলি হয়ে যাবে! সে ভয় নেই। কিন্তু যারা ভগবানের পথে যাবে তাদের বলেছেন। সকলকে বলেন নি।

বড় জিতেন জুতা মোজা লইয়া শ্রীমকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিতেছেন। স্থূল শরীর, ঘর্মাক্ত কলেবর।

শ্রীম (ছেলের প্রতি) — তুমি যাও না উপরে, প্রণাম করে এসো ঠাকুরকে। কষ্ট হয়, তাই উনি উঠতে পারেন না।

স্বামী রাঘবানন্দ —কেন আপনি তো যান।

বড় জিতেন — বড় ভারী শরীর।

স্বামী রাঘবানন্দ — আবার সিঁড়ি ভেঙ্গে না পড়ে (সকলের হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে) — দুটি considerations (বিবেচ্য বিষয়) একটা — যিনি উঠবেন, আর একটা — যার (কাঠের সিঁড়ির) ওপর উঠবেন। (সকলের উচচ হাস্য)।

বড় জিতেন সিঁড়ির গোড়ায় প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমকে বলিতেছেন — আচছা, আমি যদি ওখান থেকে (বাড়ি থকে) আপনাকে

প্রণাম করি তা হলে হবে? শ্রীম উত্তর করিলেন, হাঁ হবে। আমাদের কেন, ঠাকুরকে। বড় জিতেন বলিলেন — হাঁ আপনারা, ঠাকুর সবই।

সকাল নয়টা। শ্রীম স্নান করিতে নিচে নামিলেন। অন্তেবাসী বিদায় লইতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে? উনি উত্তর করিলেন, বেলেঘাটা। শুকলালবাবুকে দেখতে যাব। অসুখের সময় পত্র লিখেছিলেন দেওঘরে। আসতে পারি নি। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন পুনরায়, ওখানেই খাবে? অন্তেবাসী বলিলেন, আজ্ঞা হাঁ। শ্রীম পুনরায় বলিলেন, বেলা হয়ে গেল। অন্তেবাসী বলিলেন, মনোরঞ্জনের সঙ্গে রিক্সা করে চলে যাব। অন্তেবাসী ও মনোরঞ্জন ডাক্তার বি. রায়ের বাড়ি হইয়া রিক্সাতে বেলেঘাটা পৌঁছিলেন সওয়া দশটায়।

রাত্রি আটটা। ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। ভক্তগণ গাহিতেছেন, 'কনকাম্বর কমলাসন'। শ্রীম ছাদে বসা। আরতি শেষ হইলে শ্রীম নিজ হাতে দুইটি পাতায় প্রসাদী ফলমিষ্টি রাখিলেন। একটা পাতা নিজ হাতে স্বামী রাঘবানন্দকে দিলেন। অপর পাতাটি হাতে লইয়া পিছনে পূর্ব দিকে ফিরিয়া বলিতেছেন, কই জগবন্ধু সাধু মহারাজের সেবা হোক্। জগবন্ধু দাঁড়াইয়া জোড় হাতে প্রসাদের পাতা লইলেন। আর মাথায় ঠেকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, এ তো মহামৃত! কি সৌভাগ্য আমাদের! শ্রীভগবানের পার্ষদ নিজ হস্তে এই স্থূল প্রসাদের সঙ্গে দিচেছন ভক্তি বিশ্বাস, অভয় ও অহেতুক ভরসা।

শ্রীম বলিলেন, সকলকে দেওয়া হয়েছে প্রসাদ? একজন বলিলেন, কমলবাবু বাকী, আহ্নিকে আছেন। শ্রীম সাহাস্যে উত্তর করিলেন, তিনি ধ্যানে আছেন বুঝি? (সকলের হাস্য)। ধ্যান করতে গিয়ে এদিক যে হয়ে যাচেছ।

অন্তেবাসী রাত্রিতে শুইলেন 'নাটমন্দিরে', ঠাকুরের সামনে। স্বামী রাঘবানন্দ বলাই ও সুখেন্দু শুইলেন ছাদে। আজ বড় গরম।

ঠাকুরবাড়ির ছাদ। প্রভাত। সাধু ও ভক্তগণ বিছানায় বসিয়াই ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম আসিয়া 'নাটমন্দিরে' দাঁড়াইলেন। ঠাকুরঘরের ভিতর হইতে একটা ছোট নর্দমা নাটমন্দিরের পশ্চিম গা দিয়া দক্ষিণ দিকে যায়। উহা মেরামত করা হইয়াছে। শ্রীম দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, আচছা এখানে

জল দিলে যাবে কি, কে জানে? সুখেন্দু খানিকটা জল আনিয়া ঢালিয়া দিলেন। শ্রীম বলাইকেও বলিলেন — বলাইবাবু, দাও না একটু জল। বলাইও জল ঢালিলেন। সুখেন্দু ছাদের উপর ও অন্য এক স্থানে দুই তিনবার জল ঢালিলেন। ছাদের সঙ্গেও নর্দমার যোগ আছে।

শ্রীম — রাত্রি একটা দুটো থেকে কেবল ঐ ভাবছি, ছাদের নর্দমার কি হলো? সারারাত ঘুম নেই।

অন্তেবাসী — আচছা, এ কি জন্য হয় — old age বলে, না অন্য কিছু কারণে?

শ্রীম (অর্ধ উপহাসের সহিত) — মন যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙে রঙিন হবে। ধোপাঘরের কাপড়!

অন্তেবাসী (স্বগতঃ) — সে তো কাঁচা মনের। আপনাদেরও কি তাই? (প্রকাশ্যে) মায়ের সেবকদের কাছে শুনতে পাই, মা রাধুর নানা কাজ নিয়ে থাকতেন। তাতে কেউ কিছু মন্তব্য করলে ভারি অসন্তুষ্ট হতেন। ভক্তরা এর অর্থ করেন, তাঁদের মন অতি উচচ সর্বদা থাকে। লোককল্যাণের জন্য সামান্য বিষয় অবলম্বন করে তা নিচে নামিয়ে রাখেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — হাঁ, আবার —

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোহভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।। (গীতা ৪-১৪)

আবার আছে — যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।।
(গীতা ৩-২৩-২৪)

এও আছে।

সুখেন্দু (ঠাকুরঘরের পাশের নর্দমাটা দেখাইয়া) — এ স্থানটা একটু নিচু করলে হয়।

শ্রীম — না, তাহলে বেশী বিল করবে। কাজ নেই।

জল আটকাইয়া আছে। অন্তেবাসী হাতে জল সরাইতেছেন।

শ্রীম — এই রকম করলে তো যাবেই। কিন্তু, আপনা আপনি যাওয়া চাই।

সমস্ত বাড়ি মেরামত করা হইতেছে। ভাই ভূপতির একজন ভক্ত, কন্ট্রাক্টার।

শ্রীম ছাদে দাঁড়াইয়া আছেন, মধ্যস্থলে পূর্বাস্য। শ্রীম-র সামনে দাঁড়ানো অন্তেবাসী দক্ষিণাস্য, নর্দমার সম্মুখে। শ্রীম বিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, ঐ দেখুন! অন্তেবাসী চকিতে পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, আকাশের গায়ে বালসূর্য উঁকি মারিতেছে। গোলাকার মণ্ডল। উপরের দিকটা সামান্য চ্যাপটা। সূর্যমণ্ডলের উপর নিবিড় কৃষ্ণ মেঘমালা বিস্তৃত। নিচে দূরে তিনটি খেজুর বৃক্ষ।

একজন সাধু — কি আশ্চর্যময় এই মহাপুরুষদের চরিত্র। নিজে বলছেন, এ কাজের চিন্তায় রাত্রিতে নিদ্রা নাই। আবার ঐ সঙ্গেই দৃষ্টি পরব্রহ্মে সমাসীন।

শ্রীম সোজাসুজি একতলায় নামিয়া গেলেন। ভৃত্য জীবকে দিয়া ফটকের পাশের ঘরের সমস্ত রাবিশ পিটাইয়া সমান করাইতেছেন। একজন সাধু আসিয়া এই স্থানে দাঁড়াইলেন। শ্রীম তাঁহাকে দেখিয়া বলিতেছেন, ওপরে বড্ড গরম দুপুর বেলায়। ভাবছি, এখানে এসে থাকবো তখন।

দুইজন সাধু ছাদে বসিয়া ঈশ্বরীয় কথা কহিতেছেন। তাঁহারা শ্রীম-র অপেক্ষা করিতেছেন, সকালে শ্রীম ঈশ্বরীয় কথা কহিবেন আশায়। পরে শুনিলেন, আজ উপরে আসিবেন না। অমনি একজন সাধু নিচে নামিয়া গেলেন। সিঁড়ির পাশে একটি ছোট জলের চৌবাচ্চা। সাধু দেখিলেন, শ্রীম সেই চৌবাচ্চার জলে হাত ডুবাইয়া কি যেন খুঁজিতেছেন। চৌবাচ্চাটি চুন-বালিমিশ্রিত জলে বার আনা পূর্ণ। দেড় হাতের বেশী জল। সাধুকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, এটা কি ফুটো হয়ে গেল নাকি? জল বেরিয়ে যাচ্ছ। সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করতে হবে। বস্তা কোথায় সিমেন্টের? সুখেন্দু পাশে বারান্দায় বসিয়া ঠাকুরপূজার বাসন মাজার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সাধু শ্রীমকে বলিলেন, আপনি হাত উঠিয়ে নিন, আমি দেখছি। শ্রীম হাত উঠাইয়া লইলেন। শ্রীম-র বাম হাতের কনুইয়ের কাছে গরম কাপড় জড়ান। নিউরলজিক ব্যথা হয়। কালও হইয়াছিল।

সাধু জলে হাত ডুবাইয়া দেখিলেন, নিচে প্রায় আধ হাত পুরু বালির একটা স্তর। তারও নিচে হাত দিয়া দেখিলেন, চৌবাচচার জল বাহির হইবার ছিদ্রটা খোলা, বালিতে ঢাকা। ঐ পথে জল বাহির হইতেছে চুঁয়াইয়া । শ্রীমকে এই কথা বলায়, তিনি বলিলেন, আমিও ভাবছি কি হলো। এখন এটা ওঠালে হয়।

সাধু — একটা টিন চাই।

শ্রীম — ঐ যে রয়েছে একটা।

সাধু (এক টিন পূর্ণ করিয়া সুখেন্দুর প্রতি) — তুমি ধর আমি একা পারছি না ওঠাতে।

শ্রীম পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। বলিলেন, ঐখানে রাখ।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — কুলকুচো করে আসুন। হাতে পায়ে জল দিন। এতে আছে কিছু গোলমাল।

সুখেন্দু হাতে পায়ে জল দিয়া, কুলকুচো করিয়া পূজার বাসন মাজিতে বসিলেন।

শ্রীম (বালকের ভাবে সাধুর প্রতি) — সুখেন্দুবাবু বলেন, আমার বড় ছুঁচিবাই। সাধু হাসিতেছেন। সুখেন্দুবাবু বড় কর্মের লোক! চটপট সব করতে পারেন। তাড়াতাড়ি করেন, এইজন্য হাতটাত লেগেছে।

(সহাস্যে) সাধুদের প্রহার, পদপ্রহার, প্রসাদ খেলে ভাল। (সুখেন্দুকে একটি সাধু ঠাকুরবাড়িতেই প্রহার করিতে গিয়াছিলেন। তিনিও ওখানে থাকেন।)

সুখেন্দু — ভক্তি চটে যায়।

শ্রীম — না, ওতে ভাল। মার কাছে সর্বদাই আদর পায়। বাপ শাসায়। মা লুকিয়ে খেতে দেয়।

এতক্ষণ সুখেন্দুর মনে সুনামের প্রলেপ দিলেন। এখন কর্মরত সাধুর মনে ঐ প্রলেপ দিতেছেন।

শ্রীম (সুখেন্দুর প্রতি) — জগবন্ধুর ইচছা না হলে গাছের পাতাটিও নড়ে না। এই দেখ না, জগবন্ধু এসে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। (সাধু বালি উঠাইতেছেন)

একটা গল্প আছে। শুনেছি একজনের খুব পেটের অসুখ। ভক্ত

লোক। বাহ্যে যাচেছ, জল তুলবার ক্ষমতা নেই। একটি সুপুরুষ এসে জল দিচেছন। ভক্তটি বললেন, আপনি কে আমায় জল দিচেছন? লোকটি বললেন, তুমি যার চিন্তা কর দিনরাত, আমি তিনিই। ভক্ত বললেন, যদি এতই কষ্ট করছো, তবে রোগ সারিয়ে দিলেই তো হয়ে যায়। ঠাকুর বললেন — তা হবে না বাবা! তা হয় না। (শ্রীম-র উচচ বিলম্বিত হাস্য)। রোগ সারবে না। ও ভুগতে হবে।

নারদ রামকে বললেন, তুমি রাবণবধ করতে এসেছো, তা করছো না। অন্য সব কাজ করছো। রাম হেসে বললেন, দাঁড়াও রাবণের কর্ম একটু বাকী আছ, তা হয়ে যাক।

একটি সাধু (স্বগতঃ) — শ্রীম কি নিজের কথা বলিতেছেন। তিনি ছুটি চান। পাইতেছেন না। একজনকে দুঃখ করিয়া পুরীতে বলিয়াছিলেন, ‘ঠাকুর বলেছিলেন, মা আমায় বলেছেন তোমাকে তাঁর একটু কাজ করতে হবে। পঞ্চাশ বছর ধরে কাজ করছি। এখনও ছুটি দেন না।’

সাধু (প্রসন্নভাবে শ্রীম-র প্রতি) — এই রুগ্ন ভক্তটি কে — মাধুদাস, জগন্নাথী মাধুদাস কি?

শ্রীম — শুনেছি, নাম জানি না।

সাধু — ভক্তমালে আছে এ গল্পটি। আবার জগন্নাথ কাঁঠাল গাছে তুলে বেদম মার খাইয়েছিলেন। (শ্রীম-র দীর্ঘ হাস্য)।

শ্রীম (সহাস্যে) — গাছে তুলে বেদম প্রহার!

সাধু — কিন্তু পাণ্ডাদের স্বপ্নে বললেন জগন্নাথ, আমাকে আজ মেরেছে। তাতে জ্বর হয়ে গেছে। আজ আর খাওয়া হবে না। এতেও দেখালেন, ভক্ত ও ভগবান এক।

দুই টিন বালি উঠিয়াছে। আর এক টিনের দরকার।

সাধু (শ্রীম-র প্রতি) — কোন্ টিন নেবো?

শ্রীম — ‘বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা — যা দেবী সর্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা’।

সাধু একটা ড্রামে ভিজা বালি চুন উঠাইতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — কল্যাণানন্দকে মঠ থেকে পাঠিয়েছিল। সে মঠে লিখলে, মশায় আমি স্থূল কাজ করতে পারি না। এই চন্দন ঘষা প্রভৃতি কাজ করতে পারি। হাঁড়ি মাজতে দিছলো (হাস্য)।

সাধু — এখন তো সব স্থূল নিয়ে আছেন।

শ্রীম (রহস্য করিয়া) — অনুলোম বিলোম আছে না। তাই। আর একজন বলে, আমি সূক্ষ্মেতে থাকবো, ধ্যানে। তার স্থূলেতে মন থাকতে চায় না। (হাস্য)।

সাধু — একটু স্থূলেতে মন রাখা ভাল।

শ্রীম — তা আর বলতে! উটি (খাওয়া) হবে কি করে নইলে — চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়? তবে সাধুরা নিজে খান না — তাঁকে খাওয়ান!

সাধু একটা শাবল দিয়া খুঁটিয়া সব চুন বালি বাহির করিলেন। চৌবাচচা পরিষ্কার। সব জল বাহির হইয়া গিয়াছে। নল খুলিয়া শুদ্ধ জলে ধোওয়া হইয়াছে।

শ্রীম (সহাস্যে) — যাও, এবার তুমি যাও। এবার গিয়ে সূক্ষ্মে থাক।

সাধু স্বামী রাঘবানন্দের ঘরে গেলেন দোতলায়। ভক্ত নববাবু দুইটি ডাব আনিয়াছেন। একটি ঠাকুরের সেবার জন্য, অপরটিতে সাধুসেবা হবে। ইতিপূর্বে স্বামী রাঘবানন্দ সাধুকে ডাকিয়াছিলেন ডাব খাইতে। উনি কাজ ছাড়িয়া আসেন নাই। সাধু ডাব খাইবেন। কিন্তু কলতলায় উঁকি দিয়া দেখিলেন, শ্রীম-র হাতে চৌবাচচার জলের পাইপ। উনি ধরিয়া রাখিয়াছেন। একটি কুলি নারিকেলের ছোবড়া দিয়া ঘষিয়া সাফ করিতেছে। সাধু ডাব খাইলেন না, নিচে নামিয়া গিয়া শ্রীম-র হাত হইতে পাইপটা লইলেন। বলিলেন, আপনার হাতে এখনও বেদনা চলছে — ফ্ল্যানেল বাঁধা রয়েছে। শ্রীম বলিলেন — এতে কি হবে, কত হচেছ। যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন। শ্রীম গিয়া বারান্দায় বসিলেন। বলিলেন, কর্তা হলে এসব করতে হয় — এই এত সব!

নববাবু নিচে আসিয়া পাইপ ধরিলেন। সাধুকে উপরে গিয়া ডাব খাইতে বলিলেন। শ্রীম জোর করিয়া সাধুকে উপরে পাঠাইলেন। চৌবাচচা আবার সাফ করাইতেছেন।

একটি সাধু শ্রীম-র ঘরে প্রবেশ করিলেন। সম্মুখেই ঠাকুরের কথার ডায়েরী পড়িয়া আছে। তিনি ১৮৮২-৮৩ খ্রীস্টাব্দের কিছু লেখা দেখিলেন। ঠাকুরের শরীরত্যাগের পরের ঘটনাও কিছু লেখা আছে। কিন্তু সব বুঝিবার উপায় নাই। নিজের আবিষ্কৃত বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা। গতকালের লেখা পাঁচ পৃষ্ঠার কথামৃতও দেখিলেন।

অন্তেবাসী এবার বেলুড় মঠে যাইবেন। ঠাকুর প্রণাম করিয়া তিনি নিচে শ্রীমকে প্রণাম করিতে গেলেন। শ্রীম ফটকের পাশের ঘরের মেঝে ঠিক করাইতেছেন। খুব ধূলা। অন্তেবাসী চট করিয়া শ্রীম-র পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলেন। উনি পায়ে হাত দিতে দেন না। তাই বাধা দিয়া বলিতেছেন — না, না।

শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পৌত্র অরুণ প্রবেশ করিলেন। অরুণ অন্তেবাসীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। সাত দিন হয়, তাহার বিবাহ হইয়াছে। শ্রীম বলিলেন অরুণকে — অমনি না, সাষ্টাঙ্গ। সাষ্টাঙ্গ পার?

অরুণের গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী। সে বিনীতভাবে বলিল, চেষ্টা করছি। শ্রীম বলিলেন, সাষ্টাঙ্গ মানে জান কি? আট অঙ্গ দিয়ে প্রণাম — দুই হাত, দুই পা, দুই জানু — এই ছয়, আর বক্ষ আর মস্তক — এই আট অঙ্গ।

অরুণ বড় ফাঁপরে পড়িল। নূতন বিবাহের ট্যাক্স দিতে গিয়া সুন্দর নতুন ধবধবে সিল্কের পাঞ্জাবীসহ রাবিশের ধূলায় হাঁটু পর্যন্ত গাড়িয়া প্রণাম করিল।

শ্রীম বলিলেন, না না — হলো না। এই কনুই দুটি লাগবে মাটিতে। অরুণ অগত্যা তাই-ই করিল। তাহার দুই হাতের জামা কনুই পর্যন্ত ধূলায় ধূসরিত। শ্রীম-র চোখে মুখে বালকের দুষ্ট হাসি। অরুণকে বলিতেছেন, সাধুদের এই রকম প্রণাম করতে হয়। আজকাল আবার জুতো পায়ে দিয়েই প্রণাম করে পায়ে হাত লাগিয়ে।

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন— আচ্ছা, আসুন আপনি।

অন্তেবাসী ঠনঠনে কালীতলায় প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, যতীন শ্রীম-র কাছে যাইতেছেন, সঙ্গে কাশ্মীরের ভক্ত অমরনাথ। তিনি কাল সবে মঠে আসিয়াছেন জয়রামবাটী দর্শন করিয়া।

অন্তেবাসী বাসে শ্যামবাজার, তারপর এটর্নী বীরেন বসুর বাড়ি হইয়া বরানগর দিয়া কুঠিঘাটে আসিলেন। খেয়ায় স্বামী ধীরানন্দও পার হইতেছেন। খেয়ায় আরও সাধুরা ছিলেন। কানাই চন্দ্রকিশোর ও রমেশ বিদ্যাপীঠ হইতে আসিয়াছেন। আর প্রিয়নাথ আসিয়াছেন কাঁথি হইতে। স্বামীজীর মন্দিরের পিছনে সাধুরা খেয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন।

বেলুড় মঠ।
১৬ই মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বৈশাখ ১৩৩৮ সাল, সোমবার।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবীন তীর্থ

১

কলিকাতা, গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি। অপরাহ্ন চারটা। নিচের তলার কলতলায় শ্রীম নগ্ন গায়ে গামছা পরিয়া হাতমুখ ধুইতেছেন। আজ ২৫শে মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার।

একজন সাধুর প্রবেশ। শ্রীমকে যুক্ত করে তিনি প্রণাম করিলেন। শ্রীম বলিলেন — এই যে আসুন, উপরে গিয়ে বসুন। সাধু বহুকাল পর শ্রীম-র নগ্ন শরীর দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা এই শরীর কি হয়ে গেছে — অর্ধেক একেবারে! শ্রীম পুনরায় বলিলেন, হাঁ তুমি ওপরে গিয়ে বসো।

আড়াইটায় সাধুটি বেলুড় মঠ হইতে খেয়া নৌকায় ব্রহ্মচারী বিজয়ের সঙ্গে পার হইয়া কুঠিঘাটে আসেন। তারপর তিনি ঠাকুরের স্মৃতিবিজড়িত পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

প্রথম দেখিলেন বরানগর মঠ। বরানগর মঠের মাটি মাথায় করিয়া সাধু ভাবিলেন, কি পবিত্র ভূমি! এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের apostle-রা (অন্তরঙ্গরা) বাস করেছিলেন প্রথম অবস্থায়। তাঁদের কি বৈরাগ্য! ঈশ্বর সম্বল, জগতের জ্ঞান নাই। ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। এখানে পূর্বের ঐ ভাব নিয়ে একটি মঠ হলে বেশ হয়। কৌপীন সম্বল। অনাহারে, অর্ধাহারে ভগবৎধ্যানে সকলে মগ্ন।

তারপর দেখিলেন কাশীপুর শ্মশান। শ্মশানে আগুন জ্বলিতেছে। সাধু ভাবিলেন — কি পুণ্যভূমি এই স্থান! কালে হয়ত মহাতীর্থে পরিণত হবে এই স্থান, যেমন বুদ্ধদেবের দাহস্থান কুশিনারা। এইখানে ভগবানের নরকলেবর অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি, তারপর গঙ্গা। অপর পারে বেলুড় মঠ!

কাশীপুর উদ্যান দেখিলেন বাহির হইতে। এখানে একজন আর্মেনিয়ান সাহেব থাকেন। এখানেই মহাসমাধিতে মগ্ন হইয়াছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

সাধু বাসে আসিলেন শ্যামবাজার। তারপর গেলেন ৫৫ নম্বর শ্যামপুকুর। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার জন্য প্রথম কয়েক মাস ছিলেন।

সাধু পায়ে হাঁটিয়া শ্যামপুকুর হইতে চলিতেছেন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট দিয়া। মানিকতলা স্কোয়ারে ললিতবাবুর সঙ্গে দেখা হইল। তারপর আসিলেন ঠাকুরবাড়ি।

ঠাকুরবাড়ির দোতলার বড় ঘরে সাধু ও ভক্তের মজলিশ বসিয়াছে। স্বামী রাঘবানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, বলাই, খগেন ডাক্তার প্রভৃতি বসা। এরই পশ্চিমের ক্ষুদ্র কক্ষে শ্রীম বসিয়া আছেন একা। এখন পৌনে পাঁচটা। রাজামুণ্ড্রির ভক্ত শিক্ষক কৃষ্ণমূর্তির প্রবেশ। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম খগেন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনাইলেন। কথামৃত লেখা হইবে এখন। সাধুরাও সঙ্গে উঠিয়া পাশের ঘরে গেলেন।

শ্রীম খাটের উপর পূর্বাস্য বসিয়া আছেন, হাতে ডায়েরী। এক কোণে খগেন, অপর কোণে স্বামী রাঘবানন্দ বসিয়াছেন। একজন সাধু শ্রীম-র পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি দেখিলেন, শ্রীম ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, বাংলা ১২৪৪ সাল বাহির করিলেন, একটি বড় কপি বুক হইতে। তিনি বিস্ময়ে ভাবিতেছেন! কি আশ্চর্য — এই সামান্য লেখা থেকে কি বিরাট development (সম্প্রসারণ)! অবাক হতে হয় দেখে। মনে হয়, এই অদ্ভুত মহাপুরুষটিকে দৈবী মেধা ও স্মৃতিশক্তি দিয়ে তৈরী করে ঠাকুর সঙ্গে করে এনেছেন। এ যেন ফটোগ্রাফের স্লাইড। যা শুনেছেন তাই মস্তিষ্কে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। আরও মনে হচে্ছ, শ্রীম কথামৃত লেখার সময় ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন মনে। সেই শুদ্ধ সমাহিত মনে যা উদয় হচে্ছ তাই লিখছেন পূর্বে রক্ষিত নোট অবলম্বন করে। স্বামীজী ঠিক বলেছেন এই কথাই — 'It has been reserved for you this great work. He is with you evidently' (কথামৃত-রচনারূপ মহাকার্যটি পূর্ব হইতেই আপনার জন্য রক্ষিত ছিল। ইহাতেই প্রমাণিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার ভিতর বিরাজিত)। মা-ও বলেছেন, ‘তোমার নিকট

তাঁহার যে সমস্ত কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল যাহা বলিয়াছিলেন এক্ষণে আবশ্যকমত তিনিই তাহা প্রকাশ করাইতেছেন।'

এখন লেখা হইতেছে, শিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুর আসিয়াছেন। সভক্ত কেশব সেন উপস্থিত। আর আসিয়াছেন নরেন্দ্র, রাখাল, বলরাম, মাস্টার প্রভৃতিও।

সাধু দেখিলেন, শ্রীম-র খাতায় তাঁহার নিজের আবিষ্কৃত বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে লেখা — 'কামারশালের নোয়া'। ইহা হইতে শ্রীম সৃজন করিলেন এইরূপ — 'সংসারে হবে না কেন? মন কামিনীকাঞ্চনে বন্ধক হয়েছে। মন যেন কামারশালের নোয়া। যতক্ষণ আগুনে ততক্ষণ লাল, টেনে আনলেই যেই নোয়া সেই নোয়া। নিঃসঙ্গ, নয়ত সাধুসঙ্গ। নিঃসঙ্গে মন অনেক শুকিয়ে যায়। যেমন ভাঁড়ের জল শুকিয়ে যায়। তবে যদি গঙ্গাজলের জালায় ভাঁড় থাকে শুকোয় না।'

রাত্রি আটটা। কেশব সেন সব ভুলিয়া গেলেন। উপাসনা হইতেছে না। ঠাকুর পদ্ধতি অনুসরণ করিতে বলিলেন। কেশব ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ। কেশব সেন ঠাকুরকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, পড়িয়া না যান। তারপর দুপুর রাত পর্যন্ত কীর্তন ও নৃত্য।

সাধুটি প্রথমে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র নোট দেখিতেছিলেন, সৃজনী বাণী শুনিতেছিলেন। তারপর মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া বিছানায় ঝুঁকিয়া ঐরূপ করিতেছেন। শ্রীম সহাস্যে বলিলেন, আপনি বসুন। এতে অনেক সব secrets (গোপনীয় কথা) রয়েছে। সাধু দেখিলেন, ডায়েরীর সওয়া পাতা হইতে শ্রীম চার পাতা সৃজন করিলেন। ঠাকুরের মহাবাণীর প্রথম প্রসিদ্ধ অংশটুকু কেবল নোট করা আছে।

শ্রীম-র হাতে হঠাৎ বেদনা আরম্ভ হইল। মন বেশী একাগ্র করিলেই বেদনা বাড়ে। তিনি বলিলেন, শুয়ে পড়ব। সাধু হাত পাখাতে হাওয়া করিতে লাগিলেন মাথায়। শ্রীম পাখাটি চাহিয়া লইয়া গেলেন। সাধু বলিলেন, আগুনে সেঁক দি। শ্রীম বলিলেন — না, শুয়ে পড়লেই সেরে

যাবে।

স্বামী নিগমানন্দ, স্বামী গদাধরানন্দ, দুইজন বন্ধুসহ রমণী, বলাই প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত। সাধু ও ভক্তেরা সামনের বারান্দায় বসিয়া আস্তে আস্তে কথা বলিতেছেন। শ্রীম-র ঘরের দরজা ভেজান।

সন্ধ্যা হইয়াছে। পুরোহিত ধুনুচি লইয়া দোতলার পূর্ব ও উত্তরের ঘরের দেওয়ালে বিলম্বিত ঠাকুর, মা, স্বামীজী, ঠাকুরের মহাসমাধি, দুর্গা, লক্ষ্মী, চৈতন্য-সংকীর্তন প্রভৃতি দেবদেবী ও নরদেবতার ছবিতে দেখাইতেছেন। শ্রীমও নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়া সাধু ও ভক্তসঙ্গে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন।

এবার তিনতলায় আরতি হইতেছে। শ্রীম ঠাকুরঘরে উত্তরপাশে দাঁড়াইয়া যুক্ত করে দর্শন করিতেছেন। পরনে সাদাপাড় ধুতি। গায়ে ধূসর রঙের ময়লা গরম পাঞ্জাবী। তাহার উপর 'হরে কৃষ্ণ' ছাপের নামাবলী। শ্রীম-র পিছনে স্বামী নিগমানন্দ। ভক্তগণ 'নাটমন্দিরে' বসিয়া হারমোনিয়াম প্রভৃতি যন্ত্রসংযোগে সমস্বরে গাহিতেছেন, 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।'

একজন সাধু ঠাকুরঘরের দরজার বাহিরে দক্ষিণাংশে দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যস্থ শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন। তিনি ভাবিতেছেন, ইংরেজী শিক্ষিত 'ইংলিশম্যানের' ভিতর এই জ্ঞান ও ভক্তি কি করে এলো — প্রহ্লাদ ও হনুমানের মত। গায়ে আবার নামাবলী! ভক্তির চাপে বিদ্যার অহংকার একেবারে অন্তর্হিত। কি চোখ, কি মস্তিষ্কের শক্তি! ঠাকুর তাঁর চক্ষুদুটিকে তাই শালগ্রামের চক্ষু বলেছিলেন। আর তাতে তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন।

এইবার 'নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনবচনৈকাধার' গানটি গাহিতেছেন। গরমের জন্য শ্রীম বাহির হইয়া আসিলেন এবং দরজার পাশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তারপর ছাদে গিয়া বসিলেন পূর্বাস্য। স্বামী রাঘবানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত শ্রীম-র সম্মুখে বসা।

'ওঁ হ্রীং ঋতং,' 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে' ও জয়ধ্বনির সহিত আরতি শেষ হইল। এইবার রামনাম হইতে স্তব, 'ভয় হর মঙ্গল', 'কনকাম্বর' ও 'আর্তানাম্' প্রমুখ শ্লোকগুলি গীত হইয়া সব সমাপ্ত হইল।

শুকলাল, মনোরঞ্জন, সুখেন্দু, বড় অমূল্য, হিমাংশু, জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত আজ আসিয়াছেন।

এবার প্রসাদবিতরণ হইতেছে। ‘এই দাও, গয়ার সাধুকে (স্বামী নিগমানন্দকে) আম দাও। জগবন্ধু, সীতাপতি মহারাজদের দাও।’

দুইটি ঠোঙ্গা আনিয়া খগেন ডাক্তার জগবন্ধু মহারাজকে দিলেন। জগবন্ধু মহারাজ একটিতে লক্ষ্য করিয়া গণ্ডূষ করিলেন। আর একটি পড়িয়া রহিল। পরে অপর ঠোঙ্গাটি দেওয়া হইল স্বামী রাঘবানন্দকে। খগেনের এই অনবধানতার জন্য শ্রীম বলিলেন, সব দেখে দিতে হয়। তাড়াতাড়ি করতে নেই। একটু পর স্বামী রাঘবানন্দকে শ্রীম নিচে পাঠাইয়া দিলেন রাত্রির ভোজনের জন্য। ইনি এখানেই থাকেন।

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া পাতা হাতে লইয়াছেন ফেলিবার জন্য। শ্রীম উহা লক্ষ্য করিয়া লম্বা করিয়া বলিলেন, না — এত সেবক থাকতে—। সাধু পাতা ফেলিয়া আসিয়া দেখিলেন, ভোজনস্থানে একজন ভক্ত জল বুলাইতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ‘আমার ভক্তি যে বা পায় সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।’ সেবা কি কম! সেবক হওয়া বড় কঠিন।

শ্রীম (স্বামী নিত্যাত্মানন্দের প্রতি) — হাঁ, জগবন্ধুবাবু তখন মিছরি খেয়ে একটু জল খাওয়াতে বেদনা কমে গেল। মিছরি তো stimulantও (শক্তিপ্রদায়ী) বটে।

সাধু — আজ্ঞে হাঁ। আপনার হাতের ব্যথাটা আগেও ছিল কি? হাত তো আগেও মাথার ওপর রেখে চাপতেন।

শ্রীম — না, হাতে বেদনা ছিল না। Date আমার মনে থাকছে না এখন।

মাদ্রাজের ভক্ত কৃষ্ণমূর্তি (ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া) — To-morrow I will go to the Belur Math. Shall I be able to see Guru Maharaj (Swami Shivananda)? For him I have come here. [কাল বেলুড় মঠে যাব। গুরু মহারাজের (স্বামী শিবানন্দের) দর্শন হবে কি? এইজন্যেই আমি এখানে এসেছি।]

M. — If once you don't succeed, try, try again. You will be going from day to day until you see him.'

(একবার চেষ্টায় সফল না হলে বারবার চেষ্টা করা উচিত সফল না হওয়া পর্যন্ত।)

Krishnamurti — Yes, for him alone I have come. (আজ্ঞে হাঁ, ওঁকে দর্শন করবার জন্যই আমি এসেছি)।

কৃষ্ণমূর্তির প্রস্থান।

শ্রীম (অন্তেবাসীর প্রতি) — মহাপুরুষ মহারাজের শরীর কেমন, দীক্ষা চলছে?

অন্তেবাসী — দীক্ষা, দেখা, কথা — সবই চলছে। আজকাল কথা জড়িয়ে যায়, টেনে বার করতে হয়। তবে সকালে সাড়ে ছয়টা পর্যন্ত যখন সকলে প্রণাম করতে আসেন, তখন অন্য লোক। তখন পূর্বের ন্যায় সহাস্য বদন, কুশল জিজ্ঞাসা, ঠাকুরের কথা, হাসি ঠাট্টা, ফষ্টি নষ্টি সবই হয়। তারপরই এলিয়ে পড়েন।

শ্রীম — খোকা মহারাজ কেমন, আর temperature (তাপমাত্রা) কত ছিল?

অন্তেবাসী — ওঁর কাছে আমরা নিত্য যাই না। গেলেই কথা খুব বেশী বলেন। কিন্তু ডাক্তারের মানা কথা বলা। (সহাস্যে) পেটে কয়দিন অম্বল হচেছ, কিন্তু বলবেন না, পাছে খেতে না দেয়। তাই আজকাল রাত্রে কিছু খেতে দেখলাম না।

স্বামী রাঘবানন্দের ভোজনান্তে আগমন।

২

অন্তেবাসী (শ্রীম-র প্রতি) — সুকুমার মহারাজ (স্বামী সৎস্বরূপানন্দ) আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীম — কে?

অন্তেবাসী — যিনি আগে বিদ্যাপীঠের হেডমাস্টার ছিলেন, এখন তপস্যায় গেলেন।

শ্রীম — ও-ও! কোথা থেকে লিখেছেন?

অন্তেবাসী — রাজপুর অম্বিকা মন্দির থেকে। কিষণপুর আশ্রমে এসেছেন। এবার স্বর্গাশ্রম, ঋষিকেশে গিয়ে বসবেন।

অন্তেবাসী — আপনি তাঁকে যেসব কথা বলে দিয়েছেন যাবার আগে, সেসব কথা কি shape (আকার) নেবে এখনও তিনি বুঝতে পারছেন না, লিখেছেন। লিখেছেন, আসনটা পেতে বসতে পারলে তখন বুঝতে পারা যাবে।

শ্রীম — কি লিখেছেন?

অন্তেবাসী — আপনি ওঁকে বলেছিলেন তো, 'ঋষিকেশে গিয়ে গঙ্গাতীরে বসে কেবল ঠাকুরের কথা চিন্তা করা, তাঁকে নিয়ে থাকা। It is a sight for the Gods to see! (ইহা দেবদৃশ্য)।' এই সব কথা!

শ্রীম (সহাস্যে) — ও-ও! আসন গেড়ে বসে —।

স্বামী রাঘবানন্দ — বিশ্বানন্দ আপনাকে প্রণাম জানিয়েছেন।

শ্রীম — আর কি লিখেছেন?

স্বামী রাঘবানন্দ — বুদ্ধ উৎসব দেখেছেন, লিখেছেন।

শ্রীম — কোথায়?

স্বামী রাঘবানন্দ — তা জানি না।

শ্রীম — তিনি তো অনেকটা এগিয়ে পথে (বম্বে) রয়েছেন। একবার বেড়িয়ে দেখে এলে হয় বিলেত!

অন্তেবাসী — একবার কথা হয়েছিল Geneva-তে যাবার।

শ্রীম — কন্‌ফারেন্সে? গেলেন না কেন?

অন্তেবাসী — কি জন্য গেলেন না, জানি না।

শ্রীম — আমাদের ছেলেবেলায় সাধ হয়েছিল (আই. সি. এস্-এর জন্য)। ছেলেবেলা এসব হয়। ও মা, রাত্রিতে স্বপ্ন দেখছি, লণ্ডন সব fog-এ (কুয়াসায়) ঢাকা। Fog (কুয়াসা) পর্যন্ত দেখেছি (হাস্য)। আমাদের স্বপ্নেই সাধ মিটে গেছে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি — তিনটাই প্রায় একরকম।

ঠাকুর বলেছিলেন একটা গল্প। একজন চাষার একটি ছেলে মরেছে। সে কাঁদে নি। পরিবার তাকে তিরস্কার করছে। সে বললে, আমি রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম সাত ছেলের বাবা হয়েছি। আর রাজা হয়েছি। ঘুম ভাঙ্গলে দেখি, কিছুই নেই। তাই ভাবছি, এক ছেলের জন্য কাঁদবো, কি সাত ছেলের জন্য কাঁদবো।

স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী নিত্যাত্মানন্দ (সমস্বরে) — চাষীটি একটু জ্ঞানী ছিল (শ্রীম ও সকলের হাস্য)।

শ্রীম কিছুকাল নীরব রহিলেন।

শ্রীম — স্বপ্নে এমন impression (রেখাপাত) হয় যে চিরকাল মনে থাকে। আবার জাগ্রত অবস্থার কত ঘটনা fade (ক্রমে ক্রমে বিলীন) হয়ে যায়। তাহলেই হলো, সবগুলিই একরকম।

অন্তেবাসী — ঠাকুরের কথা আছে ‘স্বপ্নসিদ্ধ’।

শ্রীম — ‘সিদ্ধ’ মানে ভগবানদর্শন। স্বপ্নে ভগবানদর্শন। স্বপ্নে কারো কারো ভগবানদর্শন হয়।

বড় অমূল্য — ‘নদের নিমাই’-এর অভিনয় হচেছ। সিনগুলি মনে যেন অঙ্কিত হয়ে যায়।

শ্রীম — আবার নিত্য দেখলে ভাল লাগে না। এই যে আরতি হয়, গান হয়, নিত্য দেখলে শুনলে একরকম হয়ে যায়। স্তবগুলি নূতন হয় তো বেশ হয়। প্রথম কয়দিন বেশ লাগে। ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, change (পরিবর্তন) ভাল। একেঘেয়ে না হয়।

স্বামী রাঘবানন্দ — তা হলে change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা দরকার। কিন্তু তাঁর নিজের কথা তো বলতেন না!

শ্রীম — না, তা বলতেন না। বলতেন ঈশ্বরকে যত দেখ তত দেখতে আকাঙ্ক্ষা হয়। নিবৃত্তি নেই। তাই তো ভক্তরা দৌড়ে দৌড়ে যেত। এত বকুনি, তিরস্কার — তবুও যাচেছ। যাবে না, দাঁড়াবে কোথায়? তাঁর সম্বন্ধে ও কথা বলতেন না!

একজন ভক্ত — আচছা, তাঁর কাছে সকলেই ঈশ্বরবুদ্ধিতে যেতেন?

শ্রীম — অনেকে যেতেন। যাঁরা ওরকম যেতেন না তাঁদেরও কাজ হয়ে যেত। তিনি বলতেন, ‘লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল’।

স্বামী রাঘবানন্দ — তা হলে change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা আমাদের দরকার।

শ্রীম — তা আপনাদের কি, যাঁদের গুরুলাভ হয়েছে? তাঁদের গুরুকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। গুরু বলবেন, কি করতে হবে, কি - না?

একজন সাধু (স্বগতঃ) — গুরুর শরীর না থাকলে?

শ্রীম — গুরু মানে সচ্চিদানন্দ। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে কিছুই হবে না। কি সব আছে, গুরুতে মানুষবুদ্ধি, প্রতিমাতে মাটিবুদ্ধি — এ না করা। গুরুলাভ হলে তিনি সব বলে দেবেন। তা নইলে যেমন নৌকো এদিক একবার, ওদিক একবার করছে — যার হাল নেই, দাঁড় নেই। গুরুলাভ হলে মানুষ steady (সুস্থির) হয়ে যায়। গুরু আর কেউ নন, সচ্চিদানন্দ গুরু।

একজন ভক্ত — কুলগুরু নয়?

শ্রীম — গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। গুরু সচ্চিদানন্দের একটি রূপ।

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'

স্বামী রাঘবানন্দ — আমাদের change of scene (দৃশ্য পরিবর্তন) করা দরকার তাহলে?

শ্রীম নিরুত্তর।

শ্রীম — আচ্ছা, ঠাকুর কি কথাই বলে গেছেন — যেখানে মন বুদ্ধি থৈ পায় না! মন বুদ্ধি খবর করতে না পেরে ফিরে এলো। এখন মানুষ দাঁড়ায় কোথায়? তাই গুরুবাক্যে বিশ্বাস। বিশ্বাসের আবার ভেদ আছে, তিনি বলেছিলেন। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ খেয়েছে। 'খেয়েছে' মানে, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে।

আর তিনি বলেছেন, ঈশ্বর কৃপা করে 'শোনা'-বিশ্বাস থেকে 'দেখা', 'খাওয়া'-বিশ্বাস করে দেবেন ক্রমে। শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

অমৃতের প্রবেশ। অনেকক্ষণ যুক্ত করে দাঁড়াইয়া ঠাকুর ও শ্রীম-র উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — রাস্তায় জল আছে আজও?

দুই তিনদিন ধরিয়া প্রবল জল ঝড় হইয়া গিয়াছে।

অমৃত (কপালে যুক্ত কর সংলগ্ন রাখিয়াই) — আজ্ঞে, অল্প অল্প কোথাও আছে।

শ্রীম — এর ভেতরেই একটু শুনে নিয়েছেন (শ্রীম ও ভক্তদের উচ্চ হাস্য)।

শ্রীম (স্বামী রাঘবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া) — অমৃতবাবু কাল জলে এসেছিলেন। আমরা বললাম, আসবেন না। তিনি বললেন, না এলে কি হয় গুরুদর্শন করা! আমরা বললাম, গুরু তো ওখানেও আছেন। বললেন, আছেন মা, ঠাকুর। জিজ্ঞাসা করলাম, ধূপ দেওয়া হয়? বললেন, আজ থেকে দিতে হবে। বাড়িতে কেউ নেই। মা সেদিন (চলে) গেলেন। পরিবার নেই। তা দেখে কে? আমরা বললাম, আমাদের কথা তো শুনতে হয় (বৃষ্টিতে না আসেন)।

অমৃত সাব-রেজিস্ট্রার।

শ্রীম (অমৃতের প্রতি) — আপনার আবার ট্রানস্‌ফার কোথায় হল — বগুড়া না, কোথায়?

অমৃত — আজ্ঞে হাঁ। আর টোয়েনটিফাইভ ইয়ার্স সার্ভিস হলেই পেনসান পায় না। আরও কিছু wait (অপেক্ষা) করতে হবে।

শ্রীম (সহাস্যে) — একে বলে মর্কট-বৈরাগ্য। ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন এ সম্বন্ধে। একজনের চাকুরী নেই, গেরুয়া পরে কাশী গেল। কিছুদিন পর লিখলো, তোমরা ভাবিত হয়ো না। আমার একটি কর্ম হয়েছে। (হাস্য)। দিলে ছুঁড়ে ফেলে গেরুয়া (শ্রীম ও সকলের উচ্চ হাস্য)।

অমৃত — ভারত গভর্নমেন্টে হয়েছে। বেঙ্গল গবর্নমেন্টেরও কমিটি বসেছে। এই কিছুদিন wait (অপেক্ষা) করতে হবে।

শ্রীম (নয়নহাস্যে) — তা ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যখন করেছেন তখন বেঙ্গল গভর্নমেন্টও করবেন অবশ্য। তবে মর্কট-বৈরাগ্য থেকেও আসল বৈরাগ্য হয়। ঠাকুরকে একজন (মহেন্দ্র মুখুজ্যে) বলেছিলেন, এবার ওদের হাতে সব দিয়ে সরে পড়বো। ঠাকুর বললেন, কাপ্তেনও বলে। কিন্তু পারে কই? (তীব্র গম্ভীরভাবে) Jesus knew what was in man (মানুষের সব দুর্বলতার কথা যীশু অর্থাৎ অবতার জানেন)। কত রকম করে তিনি বেঁধে রেখেছেন!

স্বামী রাঘবানন্দ — আবার যাদের বের করে আনেন, তাদেরও, কতরকম করে আনেন। স্বামীজী চাকরী পান না। যদিও বা পেলেন, তা বদনাম দেওয়ালে ছেলেদের দিয়ে — পড়াতে পারেন না।

শ্রীম — যেখানেই যায় সেখানেই থাকতে পারছে না। লক্ষ্মীর বিয়ে হচেছ, হৃদয় বললেন ঠাকুরকে। তিনি অমনি উত্তর করলেন, লক্ষ্মী যে রাঁড় হবে। হৃদয় তাঁর মুখ চেপে ধরতে যাচেছ এই বলে — বল কি, বল কি! লক্ষ্মীকে যে তুমি অত ভালবাস। ঠাকুর বললেন, আমি কি করবো। আমি কি বলি? মা-ই বললেন।

একে বলে দেখা-বিশ্বাস — মা বললেন, আমি কি করবো?

'সদ্‌গুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে' — এই nice distinction (সূক্ষ্ম প্রভেদদৃষ্টি) সদ্‌গুরুর।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — একজন বলেছিলেন, from his (Christ's) mouth shall flow out rivers of living waters. (একজন বলেছিল, ক্রাইস্টের মুখ থেকে অমৃতপ্রদায়ী জলের কত নদী প্রবাহিত হবে।)

স্বামী রাঘবানন্দ — এখন সাড়ে নয়টা, আপনার আহারের সময় হয়ে গেছে।

শ্রীম যুক্ত করে সাধু ভক্তদের নমস্কার করিয়া দ্বিতলে গেলেন। অন্তেবাসী আজ ঠাকুরবাড়ি রহিয়া গেলেন, বেলুড় মঠে গেলেন না। রাত্রির আহারের পর বলাই ও মনোরঞ্জনের সঙ্গে তিনি ঠনঠনিয়ায় মা-কালীকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। রাত্রি বারটা পর্যন্ত জাগিয়া আজের বিবরণ ডায়েরীতে লিখিলেন। বাহিরে জল ও ঝড় হইতেছে।

৩

ঠাকুরবাড়ি। সকাল ছয়টা। 'নাট মন্দিরে' শ্রীম দরজার কাছে বসিয়া কি ভাবিতেছেন। অন্তেবাসী একতলা হইতে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ঠাকুর ও শ্রীমকে প্রণাম করিলেন। কিন্তু শ্রীম চিন্তাকুল। এদিকে লক্ষ্য নাই। আজ ২৬শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার।

স্বামী রাঘবানন্দ আসিলেন। শ্রীম বলিতেছেন, রাত্রিতে জল হয়েছে। এই জানালাটা আর ঠাকুরঘরের এই ধার দিয়ে জল পড়েছে। ছাদেও জল জমা হয়েছে। অন্তেবাসী বলিলেন, সুখেন্দু নালিতে বালি দিয়েছে। শ্রীম

বলিলেন, এতে আরও worse (খারাপ) হয়েছে. শ্রীম ঠাকুরঘরের নর্দমার কথাই ভাবিতেছেন।

শ্রীম দোতলায় নামিয়া গেলেন। বারান্দায় বসিয়া আছেন। এখন সাড়ে ছয়টা। অন্তেবাসী দাঁতের চিকিৎসার জন্য ডাক্তার বিপিন রায়ের বাড়ি যাইতেছেন। শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হয়েছে দাঁতে? অন্তেবাসী বলিলেন — রক্তপূঁজ পড়ছে। শ্রীম বলিলেন, তাহলে দেখান উচিত। ডাক্তার রায়ের সঙ্গে অন্তেবাসী মেডিক্যাল কলেজে গেলেন। ইনি দন্তবিভাগের ইন -চার্জ। দাঁত দেখাইয়া অন্তেবাসী ইউনিভার্সিটিতে ম্যাট্রিকের ফল দেখিয়া আসিলেন। বিদ্যাপীঠের ছাত্র চারজন পরীক্ষা দিয়াছিল প্রাইভেটে — বব (অমিতাভ), ঋষিকেশ, পৃথ্বীশ ও ছক্কো (চক্রবর্তী) — পাস হইয়াছে সকলেই।

পৌনে দশটা। শ্রীম দোতলার নিজকক্ষে বসা। অন্তেবাসী ফিরিয়া আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন — ডাক্তার কি বলেছেন? অন্তেবাসী বলিলেন, দুপুরে আবার যেতে বললেন।

অন্তেবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন শ্রীম-র সেবায় কিছু কাজ করতে পারেন কিনা। শ্রীম বলিলেন, না। এই দেখ সব তৈরী, কুকার বসানো হয়েছে। শ্রীম আজকাল কুকারের রান্না খান।

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ আসিয়াছেন। সঙ্গে একটি যুবক ছাত্র। ইনি বরিশাল রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ। অন্তেবাসী শ্রীম-র সঙ্গে তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বলিলেন — ইনি স্বামী বিশ্বানন্দ, স্বামী সদ্ভাবানন্দের সমসাময়িক। শ্রীম বলিলেন, উপরে গিয়ে বসুন ঠাকুরের সামনে।

শ্রীম-র ভোজন দশটার সময় আরম্ভ হইল। অতি সামান্য আহার। তাহাতেও আবার এখন সংযম — 'কথামৃত' লিখিতেছেন, তাই। দুধ আর ভাতই প্রধান খাদ্য মধ্যাহ্নে। দেড় ছটাক চালের ভাত। একটি পটলসিদ্ধ ও একটি আলুসিদ্ধ। আর একটু মুগডালসিদ্ধ। তাহাতে সামান্য হলুদ ও লবণ। শ্রীমকে কুকার খুলিয়া আহার করাইয়া অন্তেবাসী তিনতলায় আসিলেন। বেলা এগারটার সময় অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ আহার করিতে বসিলেন দোতলার বড় ঘরে। বলাই বাড়ি হইতে কিছু আহার্য আনিয়াছেন। তিনিই পরিবেশন করিতেছেন।

আহারান্তে শ্রীম বিশ্রাম করিতেছেন। অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একটি লিস্ট তৈয়ারী করিতেছেন — কলিকাতায় যে সকল স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর শুভাগমন করিয়াছিলেন। কয়েকজন সাধু ও ভক্তদ্বারা অন্তেবাসী বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়াছেন এইরূপ একটি লিস্ট তৈয়ার করার জন্য।

বেলা আড়াইটার সময় নিচে হইতে ডাকাডাকির শব্দ আসিল। শ্রীম রেলিংএ দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কে ডাকছেন? অন্তেবাসী বাহিরে আসিয়া শ্রীমকে বলিলেন — আপনি ঘরে যান, আমি দেখছি কে। তিনি নিচে নামিয়া গিয়া দেখিলেন, একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও সঙ্গে যুবতী বধূ, কোলে শিশুপুত্র। জিজ্ঞাসা করিয়া উপরে আসিতে একটু দেরী হইল। আসিতেই শ্রীম বলিলেন — কই, বললে না কি হলো? সব শুনিয়া শ্রীম ভাবিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, সতীনাথ নাই? অন্তেবাসী বলিলেন, বলুন আমিই করছি। কি করতে হবে? উনি বলিলেন, ওদের আট আনার পয়সা দিতে হবে। টাকা ভাঙ্গাইতে অন্তেবাসী বাহির হইয়া গেলেন। পাঁচ ছয়টি দোকানে মিলিল না। শেষে কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে মিঠাই-এর দোকান হইতে টাকা ভাঙ্গাইয়া ঐ বৃদ্ধকে আট আনা দিয়া উপরে আসিলেন।

শ্রীম-র হাতে সামান্য বেদনা আরম্ভ হইল। ইহা লইয়াই শুইয়া শুইয়া অন্তেবাসীকে বলিলেন, ‘এঁর নাম পণ্ডিত পঞ্চানন শিরোমণি। পুত্রবধূ সঙ্গে। পুত্র রেঙ্গুনে গিছলো কর্ম করতে। সেখানে একটা বর্মী মেয়ের সঙ্গে পড়ে গেছে। চিঠি লেখেন, কিন্তু সে আসে না। চেঁচামেচি করেন, দোষ কি! হয়তো খাওয়া হয় নি। Collection-এ (চাঁদা তুলতে) বের হন মাসে মাসে রিকসো করে।

শ্রীম সাহাস্যে বলিলেন, আপনার রেঙ্গুনে যাবার ইচছা হয় কি?’ অন্তেবাসী বলিলেন, না। মিশনের সোসাইটিতে যাবার কথা হয়েছিল। আমি বারণ করেছি। শ্রীম বালকের মত হাসিতে লাগিলেন আর বলিলেন —খবরদার, রেঙ্গুনে যাবেন না।

অন্তেবাসী ডাক্তারের বাড়িতে গেলেন তিনটায় আর ফিরিয়া আসিলেন ছয়টায়, দাঁত স্ক্র্যাপ করাইয়া। আজ অর্ধেক কাজ হইল মাত্র। তিনি দেখিলেন শ্রীম ‘কথামৃত’ লিখিতেছেন। বেদনা হইয়াছে, তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আরতি হইতেছে। শ্রীম তিন তলায় আসিয়া আরতি দর্শন করিলেন। ভজন শেষ হইলে নিচে আসিলেন। দ্বিতলের ঘরে খাটে বসিয়াছেন। গদাধর আশ্রম হইতে স্বামী গদাধরানন্দ আসিয়াছেন। তাঁহাকে শ্রীম নিজের বিছানায় বসাইলেন। একথা সেকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন — মহন্ত ললিত মহারাজ কেমন? কে কে আশ্রমে আছেন, ইত্যাদি। স্বামী গদাধরানন্দ বলিতেছেন, ব্যাকুলতা স্থায়ী হয় না। হয় আবার চলে যায়। শ্রীম বলিলেন, সঙ্ঘে থাকলে এইরূপ হয়। একটানা ভাব থাকে না। পাঁচ জনের সঙ্গে থাকা। কেউ হয়তো পড়া ভালবাসে, কেউ পূজা, জপ, ধ্যান। কেউ কর্ম, লেকচার। তাই অনেকে তপস্যা করেই জীবন কাটায়। তখন একটানা একটা ভাব নিয়ে পড়ে থাকতে পারে। স্বামী গদাধরানন্দ বলিলেন, আমিও যাব ভাবছি তপস্যায়। শ্রীম উত্তর করিলেন — হাঁ, তপস্যায় মাঝে মাঝে যাওয়া খুব দরকার। তখন মনে হয়, কেন বাড়িঘর বাপ-মা ছেড়ে এখানে এসেছি। নইলে কাজের ভীড়ে ভুলে যায় উদ্দেশ্য। ঈশ্বরলাভের জন্য সাধু হওয়া।

তাছাড়া মন সর্বদা সজাগ থাকে না। যখন জাগ্রত হয়, তখন খুব করে নিতে হয়। তখন যদি পাঁচটি কাজে আটকে যায়, কি করে আর ব্যাকুলতা থাকে! উঠে পড়ে লাগতে হয়। ঠাকুর বলেছিলেন, সোনা গলাতে বসে যদি ডাক্তারবাড়ি যায়, বাজার যায়, তবে আর সোনা গলান হয় না। স্বামী গদাধরানন্দ বলিলেন, কেহ কেহ বলে, পড়। পড়ে একটা উপাধি লাভ কর, যেমন তর্কতীর্থ। শ্রীম বলিলেন — বেদান্তবাগীশ ন্যায়বাগীশ হয় নি কেউ? 'তর্কতীর্থ' এতে আর কি তেমন? (হাস্য)।

স্বামী গদাধরানন্দ প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে আবার ডাকিলেন। মিষ্টি মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন।

রাত্রি দশটা। অন্তেবাসী পাশের ঘরে বসিয়া হ্যারিকেনের আলোতে ডায়েরী লিখিতেছেন। শ্রীম নিজকক্ষে বিছানায় শুইয়া 'হাউ হাউ' করিতেছেন বেদনায়। সারা রাতই এইরূপ চলিল। প্রায় রোজই এরূপ হয়। অন্তেবাসী ভাবিতেছেন, অবতারের পার্ষদ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরও বেদনা যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। অথচ কিছু করবারও উপায় নাই। কি প্রহেলিকা!

৪

ঠাকুরবাড়ি। কলিকাতা। ১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন। সকাল ছয়টা। শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ি মেরামত ও চুনকাম হইতেছে. একতলায় শ্রীম-র স্নানঘরের দেয়াল খানিকটা ভাঙ্গা হইয়াছে। শ্রীম সেই রাবিশ সরাইতেছেন। সারারাত হাতের ব্যথায় কষ্ট পাইয়াছেন। এখনও বাম হাতে ফ্ল্যানেল বাঁধা।

অন্তেবাসী বলিলেন — আপনি ইঁট ছাড়ুন, আমি সরাচিছ। শ্রীম বাধা না মানিয়া বলিলেন, না ছাড়। আমি যা পারি আমিই করব।

আজ ২৭শে মে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, শুক্রবার। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের কয়েকজন প্রবীণ সাধু ও অনেক ভক্তের অনুরোধে অন্তেবাসী ঠাকুরের পদস্পৃষ্ট কলিকাতা মহানগরীর স্থানসমূহ দর্শন করিতেছেন। লিস্ট করিয়া প্রতি মহল্লায় যাইতেছেন। আর প্রাচীন নাম, নম্বর ও বিবরণ লইতেছেন এবং নূতন সব পরিবর্তনও লিপিবদ্ধ করিতেছেন।

শ্রীমকে এই সংকল্পের কথা অন্তেবাসী নিবেদন করিলেন। শ্রীম প্রথমে ইহাতে অনুমতি দেন নাই, বরং বিরক্ত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, ভক্তরা হয়তো পুস্তক ছাপাইবেন এই সব বিবরণ দিয়া। অন্তেবাসী বলিলেন, সর্বদা ধ্যান জপ বা কাজে মন থাকে না। কখনও তীর্থভ্রমণে মন যায়। তখন যদি এই সব পবিত্র স্থান দেখে বেড়ান যায়, তাহলে মনে আনন্দ হয়। শ্রীম এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে অনুমতি দিলেন। আর আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন — হাঁ, এ অতি উত্তম পরিকল্পনা। তাড়াতাড়ি সেরে নাও। অন্তেবাসী বলিলেন, এতে আপনার পরামর্শ ও উপদেশ দরকার। কোথা থেকে আরম্ভ করা হবে? শ্রীম বলিলেন, এই পাড়া থেকেই আরম্ভ কর। (১) এই রাস্তার মোড়ে আর. মিত্রের বাড়ি। ঠাকুর এখানে এসেছিলেন। কেশব সেনও তাঁকে দর্শন করতে এসেছিলেন। (২) ঠনঠনে কালীবাড়ি। এখানে বসে ঠাকুর মাকে গান শোনাতেন। তখন বয়স ষোল সতের — রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়ি পূজো করতেন। (৩) ঠাকুরের দাদার বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটের টোল। সেখানে মুড়ি মুড়কির দোকান হয়েছিল পরে। এখন রাধাকৃষ্ণের ঠাকুরবাড়ি। (৪) ঐ লাইনে এর একটু পূর্বে তিন

চারখানা বাড়ি ছাড়িয়ে ঠাকুরের বাসা ছিল — খোলার বাড়ি, লাহাদের বাড়ির উল্টো দিকে রাস্তার উত্তরে। এখন সেখানে হেয়ার প্রেস।* এগুলি বেচু চ্যাটার্জির স্ট্রীটে। (৫) ঝামাপুকুর লেনে রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে পূজারী ছিলেন। (৬) ঐখানেই ঐ লেনে ২৭ নম্বর বাড়িতে মেছুয়াবাজার যেতে বাঁ হাতে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী থাকতেন। তাঁর অসুখ হয়। তাঁকে দেখতে ঐ বাড়িতেও এসেছিলেন। (৭) মেছুয়াবাজার নববিধান ব্রাহ্মসমাজে প্রায়ই আসতেন। ঐ রাস্তায়ই দিগম্বর মিত্রের বাড়ি ছাড়িয়ে একই ফুটপাথে ঈশান মুখুজ্জ্যের বাড়ি। ওখানে এসে ভোজন করেছিলেন। (৮) মেছুয়াবাজার আর সার্কুলার রোডের মোড়ে কেশব সেনের বাড়ি 'লিলি কটেজ'। সেখানে কয়েকবার এসেছিলেন। ওপরের ঠাকুরঘরে কেশববাবু ঠাকুরের পা পূজো করেছিলেন। (৯) বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ি। ওখানে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন তাঁর দয়ার কথা শুনে। (১০) কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীটে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। নরেন্দ্রকে দেখতে ওখানে এসেছিলেন। (১১) সিমুলিয়া নরেন্দ্রদের বাড়িতে এসেছিলেন। (১২) রামবাবুর বাড়িও ওদিকেই — অক্সফোর্ড মিশনের পেছনে। ও বাড়ি ভেঙ্গে রাস্তা হয়েছে। (১৩) সিমলা স্ট্রীটে মনমোহনবাবুর বাড়ি। (১৪) ও পাড়াতেই আর একস্থানে ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নরেন্দ্রকে প্রথম দেখেন। (১৫) হ্যারিসন রোডে কাশী মল্লিকের ঠাকুরবাড়ি। ওখানে সিংহবাহিনীকে দর্শন করেন। (১৬) সিন্দুরিয়াপট্টিতে মণি মল্লিকের বাড়ি। ওখানে ব্রাহ্ম সমাজের অধিবেশনে এসেছিলেন। এখন সেখানে জৈন মন্দির। (১৭) সুতাপট্টীতে লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারীর বাড়ি। (১৮) কলুটোলার চৈতন্যসভা। (১৯) জানবাজারে রাণী রাসমণির বাড়ি। (২০) গির্জায়ও গিছলেন ওদিকে (মেথডিস্ট চার্চে)। বাইরে থেকে 'ম্যাস' দেখেন। (২১) কালিঘাটে মা-কালীকে দর্শন করেছেন। (২২) ভবানীপুরে একজন উকিলের বাড়ি গিছলেন। সেটা locate (বের) করা গেল না। (২৩) গঙ্গার ঘাট — জগন্নাথ ঘাটে নেমেছিলেন। (২৪) কয়লাঘাটেও

---

*এখন সে সব ভেঙ্গে বড় পাকা বাড়ি হয়েছে। রাস্তার উপর ফুটপাথে একটা জলের কলের পাশ দিয়ে আগে রাস্তা ছিল।

নেমেছিলেন। (২৫) মিউজিয়াম দেখেছিলেন। (২৬) গড়ের মাঠে সার্কাস দেখেছিলেন। (২৭) লাট সাহেবের বাড়ি হৃদয় দেখালে বললেন, হাঁ, দেখছি মাটির ঢিপি। (২৮) বড়বাজার রতন সরকার স্কোয়ারে যেখানে গঙ্গাসাগর যাত্রী জমায়েত হয়, তার গায়ে জয়গোপাল সেনের বাড়ি। (২৯) যদু মল্লিকের বাড়ি পাথুরিয়াঘাটা। (৩০) চিৎপুর আদি ব্রাহ্ম সমাজ। (৩১) জোড়াসাঁকোতে দেবেন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। (৩২) জোড়াসাঁকোতে হরিসভায়ও গিছলেন। (৩৩) হরতকীবাগানে এক ভক্তের বাড়ি। (৩৪) কাঁকুড়গাছি রামবাবুর বাগান। (৩৫) ঐখানে সুরেশবাবুর বাগান।। (৩৬) শ্যামবাজারে ডাক্তার কালীর বাড়ি। (৩৭) শ্যামপুকুরে অসুস্থ হয়ে ছিলেন এক বাড়িতে। (৩৮) বাগবাজার নন্দ বসুর বাড়ী। (৩৯) ব্রাহ্মণীর বাড়ি। (৪০) বলরাম মন্দির। (৪১) গিরিশবাবুর বাড়ি। (৪২) সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি। (৪৩) মদনমোহন মন্দির। (৪৪) শ্যামপুকুরে কম্বলীটোলায় আমাদের বাসায় গিছলেন। (৪৫) দেবেন মজুমদার ম'শায়ের বাসায়। (৪৬) স্টার থিয়েটার — বিডন স্ট্রীটে ছিল। সেখানে চৈতন্যলীলা দেখেছিলেন। (৪৭) শোভাবাজারে অধর সেনের বাড়ি। (৪৮) অসুখের সময় বাগবাজারে প্রথম একটা বাড়িতে কিছুকাল ছিলেন, গঙ্গার ধারে। সেখান থেকে বলরামবাবুর বাড়ি চলে আসেন। ছোট বাড়ি ছিল বলে পছন্দ হয় নি। (৪৯) বাগবাজার খালের পুলের কাছে ভট্চার্যের বাড়িতে মথুরবাবুর সঙ্গে এসেছিলেন। (৫০) নন্দবাগান ব্রাহ্মসমাজ। (৫১) হাঁ, যতীন ঠাকুরের বাড়িতে গিছলেন। (৫২) মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি। এখন এই পর্যন্ত থাক। পরে হবে বাকী সব। সবই মহাতীর্থ। তাঁর চরণরজেঃ সব জীবন্ত। এসব কেউ যদি দেখে বেড়ায়, তাতেই তার হয়ে যাবে। কয়েটা স্থান বাদ পড়ে গেছে। পরে বলবো দ্বিতীয় লিস্টে।

অন্তেবাসী বড়বাজারে গেলেন। ডাক্তার কানাই ও ডাক্তার নরেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। দীনবন্ধুর সঙ্গেও আলাপ করেন। দীনবন্ধু একটি ঘটনা বলিলেন, একটি ভক্ত-পরিবারে পুরুষ কেউ নেই। কিন্তু অপর লোকের ভেতর ভগবান কর্তব্যবুদ্ধি দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছেন — কুমারীদের বিবাহাদি পর্যন্ত। অন্তেবাসী এই ঘটনার কথা শুনিয়া ভক্তিতে আপ্লুত হইয়া আনন্দে ভাবিতে লাগিলেন, ঈশ্বরের কি করুণা! সব করিয়ে নিচেছন।

শুধু আমরা তাঁকে স্মরণ করে পড়ে থাকতে পারলে বাঁচি। আর ঠাকুরের কথা স্মরণ করিলেন, ‘যার কেউ নেই তার হরি আছে।’ শ্রীমকেও ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ‘তুমি এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থেকে যাও। বাড়িতে এমন কিছু দুর্ঘটনা হলে, পাড়ার লোক এসে দেখবে।’

অন্তেবাসী সিন্দুরিয়াপট্টিতে মণি মল্লিকের বাড়ি দেখিতে গিয়া দেখিলেন ঐ বাড়ি ভগবানের মন্দিরে পরিণত হইয়াছে। জৈন ভক্তগণ খরিদ করিয়া ভগবান পরেশনাথ মহাবীরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বর্তমান নম্বর, ৪২/২ আপার চিৎপুর রোড।

সিন্দুরিয়াপট্টির মোড়ের কাছেই হ্যারিসন রোডে তারপর দর্শন করিলেন সিংহবাহিনী কাশী মল্লিকের ঠাকুর বাড়িতে।

আরও কয়েক স্থান দর্শন করিয়া অন্তেবাসী ঠাকুরবাড়ি ফিরিলেন বেলা সাড়ে এগারটায়। শ্রীম আহার শেষ করিয়া বসিয়া আছেন। কথামৃতের দিনপঞ্জী বলিবেন, আর সতীনাথ লিখিবে। তাহার অপেক্ষা। শ্রীম অন্তেবাসীকে দেখিয়াই বলিলেন, চান কর। এত বেলা হল — কোথায় গিছলে? একলাই ঘুরেছিলে, না কেউ ছিল সঙ্গে।

ফরটি নাইন ইয়ার্স ব্যাকের (পূর্বের) এসব কথা হচেছ (দিনপঞ্জীতে)। আমার মনে হচেছ যেন কাল হয়ে গেল। কি impression-ই (স্মৃতি) তিনি দিয়ে দিয়েছেন।

অন্তেবাসী ও স্বামী রাঘবানন্দ একসঙ্গে আহার করিলেন। শ্রীম নিজ খাটে বসা। শ্রীম দিনপঞ্জী বলিতেছেন, দক্ষিণের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া অন্তেবাসী শুনিতেছেন।

বালক সতুর প্রবেশ। সতু শ্রীম-র দৌহিত্র। হুগলী বাড়ি। সেখান হইতে আসিয়াছে, হাতে মিষ্টি আর আম। উহা রাখিয়া সে অন্তেবাসীর পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিল। তিনি তাহাকে হাত ধুইতে বলিলেন, পাছে ঐ হাত শ্রীম-র পায়ে লাগে এই ভাবিয়া। শ্রীম শুনিয়া বলিলেন, না ঐ হাত ধুতে হয় না। মাথায় হাত দাও! মাথায় গঙ্গা রয়েছেন।

একজন সাধু ভাবিতেছেন, মহাপুরুষদের আচরণ বিচিত্র! শ্রীম-র পায়ে আমরা হাত দিলে, তখনই তা ধুতে বলেন, কুলকুচো করতে বলেন। কিন্তু সাধুর পায়ে দেওয়া হাত ধুতে বারণ করছেন। কি জীবন্ত

বিশ্বাস, সাধু নারায়ণ!

শ্রীম অন্তেবাসীকে বলিলেন, অনেক ঘুরেছ সকালে। এখন যাও বিশ্রাম কর গে।

বিশ্রামান্তে অন্তেবাসী পুনরায় ঠাকুরের স্থানসমূহ দেখিতে বাহির হইলেন। প্রথমে গেলেন — বাদুড়বাগান বিদ্যাসাগর-ভবনে। এখন আর বাড়ির পূর্বাবস্থা নাই। দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি ছিল পশ্চিমে। সামনে বড় বিলিতি ঝাউ গাছ ছিল। প্রবেশদ্বারাদি সবই বদলাইয়া গিয়াছে, এখন ঐ বাড়িতে একটি স্কুল।

এবার ‘কমল কুটীর’ (Lily Cottage)। এখানেও মেয়েদের স্কুল হইয়াছে — ‘ভিক্টোরিয়া স্কুল’। ইহা ব্রাহ্ম আচার্য কেশব সেন মহাশয়ের বাসগৃহ। বহুবার ঠাকুর এখানে আসিয়াছেন। এখানেই কেশববাবু ঠাকুরের পাদপূজা করিয়াছিলেন — দ্বিতলের স্যাংচুয়ারীতে (Sanctuary)। তাই এই মন্দিরটি আজও এত উদ্দীপনাপূর্ণ!

স্যাংচুয়ারীর ভিতরে বসিয়া অন্তেবাসী প্রার্থনা করিলেন — “ঠাকুর, মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।” আপনা হইতেই ঠাকুরের এই প্রার্থনাটি হৃদয় মন্দির হইতে নির্গত হইল।*

৫

ডক্টার বি. রায়ের বাড়িতে পটলডাঙ্গায় দাঁত সাফ করাইয়া অন্তেবাসী কলুটোলায় প্রবেশ করিলেন। উদ্দেশ্য, চৈতন্যসভার স্থানটি আজ বাহির করিবেন। শ্রীম বলিয়াছিলেন, তিনি খুঁজিয়া পান নাই। রাস্তা এত বদল হইয়াছে। অন্তেবাসী তাই স্থির করিলেন সত্তর বৎসর বয়স্ক লোক কে কে আছেন এ পাড়ায়, প্রথমে তাহা বাহির করিবেন।

২৬ডি, দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীটে তিনি প্রবেশ করিলেন। উহা স্কুল অব্ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের বিপরীত দিকে সেন্ট্রাল এভিনিউ-এর অপর পারে।

---

* এখন দ্বিতলের পূজার ঘর ভাঙ্গা হইয়াছে। নিচের পূজার ঘর রহিয়াছে। দ্বিতলে কেবল কেশববাবুর শয়নঘর রাখা হইয়াছে। সমগ্র প্রাচীন বাড়ি, বৈঠকখানার চিহ্নও নাই। নূতন বাড়িতে ভিক্টোরিয়া গার্লস কলেজ।

ডান হাতে খুব উঁচু ভিত্তিওয়ালা একটি বাড়ি দেখিলেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। একটি যুবক বসা, বয়স পঁয়ত্রিশ, স্থূলকায়। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ পাড়ায় বৃদ্ধ লোক কে কে আছেন? যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য? অন্তেবাসী বলিলেন, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এখানে এসেছিলেন চৈতন্যসভায়। সেই স্থানটি দর্শন করিবার ইচছা।

গৃহের পশ্চিম দিকে একটি বৃদ্ধ চেয়ারে বসিয়াছিলেন, হাতে হরিনামের মালা, কপালে চন্দনের তিলক। সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, গলায় তুলসীর মালা। অন্তেবাসী পূর্বেই লক্ষ্য করিতেছিলেন, বৃদ্ধ সশ্রদ্ধ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছেন আর তাঁহার সব কথা শুনিতেছেন। 'পরমহংসদেব' — এই কথাটি শুনামাত্র তিনি ক্ষিপ্রগতিতে আসিয়া অন্তেবাসীকে আলিঙ্গন করিলেন আর বালকের ন্যায় কাঁদিয়া অজস্র প্রেমাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। উচছ্ব সিত ভাব। একটু স্থির হইয়া বলিলেন — বাবা, আমি এক পাপী এখানে রয়েছি। বুড়ো হয়েছি, তবুও বিষয় ছাড়ছে না। আপনি যাঁর নামে এই যৌবনে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, তাঁর দর্শন পেয়ে, কৃপা পেয়ে, অত ভালবাসা পেয়েও আমার হলো না। বলিয়াই হাউ হাউ করিয়া উচৈচঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। অন্তেবাসী তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কে শুনে তাঁহার কথা। কিছুকাল পর কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে অন্তেবাসী বলিলেন — মশায়, আপনি আমাদের পূজনীয় ব্যক্তি। আপনি সাক্ষাৎ নররূপী ভগবানের চরণস্পর্শে পাকা সোনা হয়ে গেছেন। তাঁর ভালবাসার কথা আমাদের কিছু বলুন।

কুঞ্জ মল্লিক — আগে চলুন চৈতন্যসভা দেখিয়ে আনি। (একটি বাড়ি দেখাইয়া) এ বাড়িতে (৩২/২ দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট) চৈতন্যসভা ছিল। এখন আর কিছু নেই। কালীধর এ বাড়ির মালিক ছিলেন। এখন পূর্ণবাবু পেয়েছেন। ইনি জ্ঞাতি দৌহিত্র। (বাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়া) এই উঠোন, ঠাকুর দালান, তিন দিকের দালান ও পিলার, সদর দরজা — সবই সেই সময়কার। অদলবদল হয়ে গেছে কিছু শরিকদের ভিতর। উঠোনটা আরও বড় ছিল। প্রায় এক তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়েছে। উঠোনের

এখানটায় (পূর্ব প্রান্তে) একটা তক্তাপোশ পাতা হতো। তার উপর আসন। তাতে বসে চৈতন্যদাস বাবাজী পশ্চিমাস্য ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। আর এইখানে চৈতন্যদেবের আসন হতো (ঠাকুর দালানের মধ্যস্থলে দক্ষিণাস্য)। পাশেই তুলসী, টবে রাখা হতো। উঠোনে সব শ্রোতারা নিচে সতরঞ্চিতে বসতেন। ঠাকুর এই আসনেই বসেছিলেন। অনেক দিনের কথা। সব কথা সঠিক বলা কঠিন। আমার তখন বয়স দশ কি বার বছর।

অন্তেবাসী কুঞ্জবাবুকে ধন্যবাদ দিয়া নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেছেন। তিনি যুক্ত করে আর্তির ভাবে বলিলেন — সে কি কথা! ঠাকুর নিজে আচরণ করে যা আমাদের শিখিয়েছেন তা আমায় পালন করতে দিন। এই অনুরোধের অধিকার তিনিই দিয়েছেন। বলতেন, 'গৃহস্থ বাড়িতে সাধু এলে মিষ্টিমুখ করাতে হয়'। একবার দয়া করে চলুন ওপরে, পায়ের ধূলো দেবেন।

অন্তেবাসী দেখিলেন প্রকাণ্ড বাড়ি। বড় বড় ঘর ও দালান। সব ঘরেই ঠাকুরদের ছবি। একঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো আছে চৈতন্য-সংকীর্তনের বিশাল এক তৈলচিত্র। সাত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। চৈতন্যদেব মধ্যস্থলে। পুরীতে রথাগ্রে নৃত্যরত। দ্বাদশ পুরী, ছয় ভারতী, পঞ্চ তত্ত্ব, ছয় গোস্বামী, চৌষট্টি মহন্তর ছবিও অন্য ঘরের দেয়ালে টাঙ্গানো রহিয়াছে। বাড়িটি যেন একটি আর্ট গ্যালারী। ধন্য গৃহকর্তা! অর্থের কি সদ্ব্যবহার। আর এক ঘরে দেখিলেন, ব্রজের প্রধানা অষ্ট সখী। অষ্ট দল। আবার চৌষট্টি সখী। এগুলি সবই তৈলচিত্র।

কুঞ্জ মল্লিক — এ বাড়িতে বহুকাল ধরে হরিসভা ছিল। এখানে ঠাকুরের সন্তান ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামী আসতেন। লক্ষ্মীদিদি কখনও এসে থাকতেন। চরণদাস বাবাজীর এটা আড্ডা ছিল। তাঁর শিষ্য রামদাস বাবাজীও কখনও থেকেছেন। অত মহাপুরুষসঙ্গ ও কৃপালাভ হয়েছে, তবুও বিষয় ছাড়ছে না। কি দুর্ভাগ্য আমার (হাউ হাউ করিয়া ক্রন্দন)।

অন্তেবাসী (পুনরায় প্রবোধ দিয়া) — আপনাকে কি বলবো বলুন। আমরা তাঁর নাম শুনে এসেছি, তাঁর ভক্তদের দেখে। আমাদের বিশ্বাস তিনি আমাদের পরম কল্যাণ করবেন। তিনি নিজ মুখে বলছেন, 'ভগবান

এই শরীরে অবতীর্ণ হয়েছেন’। আর শ্রীম-র মুখে শুনেছি, ঠাকুর প্রতিজ্ঞা করে বলেছিলেন — ‘মাইরি বলছি, যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, শান্তি, সুখ, প্রেম, সমাধি — এসব আমার ঐশ্বর্য।’ আরো বলেছেন, ‘চৈতন্যদেব আর আমি এক’। বলেছেন, ‘আমার ধ্যান করলেই হবে। তোদের বেশি কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে এ জানলেই হবে।’

আপনি নরকলেবরধারী বাক্যমনের অতীত অখণ্ড সচিচদানন্দকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছেন, পাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাঁর স্নেহ ভালবাসা পেয়েছেন, আপনি যে পাকা সোনা হয়ে গেছেন! যেখানেই তিনি রাখুন আপনারা সৌভাগ্যবান, ভাবনা কি?

তবে বৃন্দাবনে থাকলে বাইরের আনন্দও পাওয়া যায়। সেখানে সর্বদা উৎসব। সৎসঙ্গ, মহাতীর্থ — এসব অনায়াসে হয়। আর তাঁর যদি ইচছা হয় আপনি এখানেই থাকুন, তাতেই বা কি! যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা করেছেন তাঁর সঙ্গে, সেই সব কথা বসে ভাবুন। এই মহাসাধনা। তাঁকে প্রার্থনা ছাড়া আর আমরা কি করতে পারি? তাঁকে বলতে পারা যায়, এই মাত্র কাজ। করা না করা তাঁর ইচছা। পূর্বে পঞ্চাশ বছর হলেই গৃহ ছেড়ে বানপ্রস্থ নিতেন লোক। আপনার ছিয়াত্তর।

কুঞ্জবাবু — বাবা, তিনবার গেছি বৃন্দাবনে, তিনবারই বিষয় টেনে এনেছে এখানে। বৃন্দাবনে ঠাকুরবাড়ি ও সেবা আছে, কিন্তু থাকতে দেন না, এমনি প্রারব্ধ। ছেলে দুটি গেছে। উনপঞ্চাশ বছরে পরিবারও গত হয়েছেন। ভাইপো ছিল, সেও গেছে। এখন একটি বিধবা পুত্রবধূ আছেন। এবার আগামী মাসে, আষাঢ়ে আর একবার শেষ চেষ্টা করবো ভাবছি। তিনি ইচছাময়। তাঁর ইচছা হলেই হবে।

বাড়ির ভিতর হইতে রেকাবে ঘরে-প্রস্তুত উত্তম মিষ্টান্ন আসিল। গ্লাসে জল আর পান। অন্তেবাসী খাইতেছেন আর মল্লিক মহাশয় কথা কহিতেছেন।

কুঞ্জ মল্লিক — আমার বয়েস তখন ষোল বছর। সবে পড়া ছেড়েছি। কাজে ঢুক্‌ছি। মণি মল্লিক মশায় একদিন বললেন, চল সাধু দর্শন করে

আসবে, দক্ষিণেশ্বর চল। উনি তিলি, আমরা সুবর্ণ বণিক। তিনি আমার ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন। তাই আমাদের নাতির মত দেখতেন।

আমরা প্রণাম করে মেঝেতে বসলে, তিনি উঠে গিয়ে সিকা থেকে সন্দেশ আনলেন। আমার হাতে আগে দিলেন। বললেন, খেয়ে ফেল। আর একদিন নিজ হাতে মুখে তুলে সন্দেশ খাইয়েছিলেন (হাউ হাউ শব্দে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন)। অত স্নেহ পেয়েও কিছু হল না।

অন্তেবাসী — আপনি স্থির হোন। আপনি কত ভাগ্যবান সেটা স্মরণ করুন। ভগবান নিজ হাতে প্রসাদ দিয়েছেন মুখে তুলে। সন্দেশ নয়, মিষ্টি নয় — এ জ্ঞান-ভক্তির ঢেলা। মুক্তি আপনাদের পেছনে পেছনে চলবে।

কুঞ্জ মল্লিক (শান্ত ভাবে) — তাঁর সম্বন্ধে দু’টি কথা মনে সদা জাগ্রত আছে — একটি বালকবৎ ব্যবহার, কথা ও আনন্দময় ভাব। আর একটি — দুনিয়াছাড়া ভালবাসা। অমন ভালবাসা এ জীবনে কোথাও দেখিনি।

একদিন বিকেলে গিয়েছি। ঠাকুর গিরিশ ঘোষের চৈতন্যলীলা দেখতে যাবেন। সব প্রস্তুত। আমাকে দেখেই বললেন, ‘এসেছিস্, আয় এদিকে আয়। আমি এখনই বেরুব।’ এই কথা বলেই তাক থেকে সন্দেশ নিয়ে আমার হাতে দিলেন। আর ওঁর হাতটা আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন। তখন আনন্দে আমি ডুবে গেলাম। অমন আনন্দ আমার জীবনে আর কখনও হয়নি।

আর একদিন নরেন্দ্র গান শোনাচেছন। ঠাকুর ছোট খাটটিতে বসা, সমাধিস্থ। সমাধি ভেঙ্গে গেলে ঠাকুর নেমে এলেন আর মেঝেতেই বসে পড়লেন ঠাকুরবাড়ি ঢুকবার দরজার গোড়ায়। নরেন্দ্র তখন ওঁর পায়ে মাথা ঘষতে ঘষতে কাঁদতে লাগলেন। দুই চক্ষু তাঁর জলে ভেসে যাচেছ।

এ দু’টি ঘটনা আমার মনে আছে। আমার বিয়ে হয় উনিশ বছরে। আর পঁচিশের সময় ঠাকুরের শরীর যায়। মাঝে মাঝে যেতাম। এখন আমার বয়স ছিয়াত্তর।

(ছলছল চক্ষুতে) আপনারা তাঁর নাম শুনে সব ছেড়েছেন। আমি সাক্ষাৎ দর্শন কৃপা পেয়েও ছাড়তে পারছি না।

অন্তেবাসী প্রায় দুই ঘন্টার পর বিদায় লইলেন। মল্লিক মহাশয় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, যদি এদিকে আসেন আমায় কৃতার্থ করবেন দর্শন দিয়ে।

অন্তেবাসী প্রায় সাতটায় ঠাকুরবাড়ি আসিলেন। তখন আরতি হইতেছে। শ্রীম ঠাকুরঘরে নামাবলী গায়ে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া আছেন। অন্তেবাসী আরতির পর আবার বাহির হইলেন। তাই আজের দর্শনের কথা শ্রীমকে বলিতে পারিলেন না। সাড়ে আটটায় তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ি গেলেন শুকলাল ও মনোরঞ্জনের সঙ্গে। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দর্শন করিয়া জয়গোপাল সেনের বাড়ি গেলেন রতন সরকার স্কোয়ারে, সুখেন্দুর কাছে। সেখান হইতে সুখেন্দুকে লইয়া খিলাত ঘোষ, যদু মল্লিক ও যতীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি দর্শন করিবেন। এই সব স্থানই শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণরজঃসিঞ্চিত।

রাত্রি সাড়ে নয়টায় সুখেন্দু ও অন্তেবাসী ডাক্তার নরেন রায়ের বাড়িতে ভোজন করিলেন। ঠাকুরবাড়ি ফিরিলেন রাত্রি সাড়ে এগারটায়। সকলে নিদ্রিত।

আজ শুক্রবার, ২৭শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।

৬

কলিকাতা। ঠাকুরবাড়ি। প্রভাত চারিটা। শ্রীম আজ একা বেড়াইতে বাহির হইলেন। ফিরিয়া আসিলেন প্রায় ছয়টায়। অন্তেবাসী শ্রীম-র ঘরে ঢুকিয়া প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, একা কেন বেড়াতে গেলেন? শ্রীম উত্তর করিলেন, না বেড়ালে বড়ই nervous হয়ে পড়ি (ঘাবড়িয়ে যাই)। মনে হয় আর বুঝি চলতে পারবো না।

শ্রীম-র মশারি এখনও খাটান রহিয়াছে। অন্তেবাসী খুলিয়া ভাঁজ করিতেছেন। শ্রীম বলিলেন — না, আমায় দাও। তুমি পারবে না। মঠের মত করতে হবে। অন্তেবাসী ভাঁজ করিয়া একখানা ন্যাকড়াতে জড়াইয়া রাখিয়া বলিলেন, মঠে এ ভাবেই রাখি।

শ্রীম — কাল বিকেলে ও রাত্রিতে ঠাকুরের কোন্ কোন্ স্থান দর্শন হলো?

অন্তেবাসী — এ পাড়ার সব হয়েছে। আর রাত্রিতে গিছলাম সুখেন্দুকে নিয়ে জয়গোপাল সেন, খিলাত ঘোষ, যদু মল্লিক ও যতীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি। বিকালে একা অনেক কষ্ট করে চৈতন্যসভা আবিষ্কার করা গেল।

শ্রীম (কৌতূহলানন্দে) — কোথায় সেটি! আমি বার করবার জন্য গিয়েছি, কিন্তু কোন্ জায়গাটা identify (সনাক্ত) করতে পারি নি। আজকাল রাস্তা সব বদলে গেছে। অন্তেবাসী — ট্রপিকাল স্কুলের opposite-এ (উল্টা দিকে)। এখন নাম সে রাস্তার — দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট, ৩২/২।

শ্রীম — কি করে বার করলে?

অন্তেবাসী (সহাস্যে) — সত্তর বৎসর বয়স্ক কে কে আছেন কলুটোলায় খুঁজতে বের হয়ে প্রথমেই fortunately (সৌভাগ্যক্রমে) পেলাম কুঞ্জ মল্লিক মশায়কে। তাঁর সাহায্যে বার করলাম।

শ্রীম — হাঁ, তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেছেন। এখনো বেঁচে আছেন জানা ছিল না। ওঁর বাড়িতে আমরা গিয়েছি চৈতন্যদেবের সব ছবি দেখতে।

অন্তেবাসী — আমিও দেখে আশ্চর্য হলাম। অতবড় আর দামী ছবি কোথাও দেখি নি চৈতন্যদেবের।

শ্রীম — ও বাড়িতেও হরিসভা ছিল।

অন্তেবাসী — আজ্ঞা হাঁ, কুঞ্জবাবু বললেন। আর বললেন, ত্রিগুণাতীত স্বামী, লক্ষ্মীদিদি এঁরাও যেতেন। আর চরণদাস বাবাজীও ওখানে থাকতেন।

শ্রীম — ঠাকুরের সম্বন্ধে কি কিছু বলা হল?

অন্তেবাসী — বললেন, ঠাকুরের কথা স্মরণ হলেই দু'টি চিত্র মনে আসে। ঠাকুর যেন সদানন্দ বালক! আর অমন ভালবাসা জগতে কোথাও তিনি দেখেন নি।

শ্রীম — যাঁরা মিশেছেন সকলেই এ কথা বলেন — সদানন্দ বালক ও মূর্তিমান ভালবাসা। আর কিছু কথা হল?

অন্তেবাসী — দুই দিনের দুইটি ঘটনা বললেন। চৈতন্যলীলা দেখতে যেদিন ঠাকুর এসেছিলেন সেই দিন ওঁকে তাক থেকে সন্দেশ খেতে

দিলেন। তারপর মাথায় সেই হাত বুলিয়ে দিলেন। কুঞ্জবাবু বললেন, অমন আনন্দ আমার জীবনে আর পাই নি, ঐ হাত মাথায় লাগায়।

শ্রীম — ঠিক, আর একটি কি?

অন্তেবাসী — স্বামীজীর গান শুনে ছোট খাটে ঠাকুর সমাধিস্থ। সমাধিভঙ্গের পর দক্ষিণ-পূর্ব দরজার সামনে এসে ঠাকুর মেঝেতে বসে পড়লেন। আর স্বামীজী ভাবে ঠাকুরের পায়ে মাথা ঘষতে লাগলেন, চক্ষে অজস্র প্রেমাশ্রু।

শ্রীম কিছুকাল স্থির, নীরব। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেমসাগরে বুঝি মন বিলীন।

শ্রীম — আর কি বললেন?

অন্তেবাসী — ষোল বছর বয়সে মণি মল্লিকের সঙ্গে প্রথম ঠাকুরকে দর্শন করেন। উনিশে বিয়ে হয়। ঊনপঞ্চাশে স্ত্রীবিয়োগ। তারপর দু'টি ছেলেও গত হয়। এখন এক বিধবা পুত্রবধূ কেবল ঘরে। কেঁদে আকুল এই বলে, তিনবার বৃন্দাবনে গেছেন কিন্তু বিষয় টেনে আনে। আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদছিলেন এই বলে, আপনারা তাঁর নাম শুনে এসেছেন এই যুবাবস্থায়। আমার এমন দুর্ভাগ্য — তাঁর চরণ স্পর্শ করে, তাঁর এত ভালবাসা পেয়েও কিছুই হলো না। এখন বয়স ছিয়াত্তর।

শ্রীম — আপনি কি বললেন তাতে?

অন্তেবাসী — আমি বললাম, আপনি সাক্ষাৎ ভগবানের ভালবাসা পেয়েছেন, সোনা হয়ে গেছেন! যেখানেই তিনি রাখেন সেখানেই থাকবেন। আপনারা সৌভাগ্যবান্।

শ্রীম — সবই এখন চলবার পথে। আমরা যখন যাই চৈতন্যসভায় তখন কালী ধরের ছেলেরা ছিলেন।

অন্তেবাসী — আচছা, বিদ্যাসাগর-বাটির দক্ষিণ দরজা দিয়ে ঠাকুর গিয়েছিলেন কি?

শ্রীম — না, পশ্চিমের দরজায়। ওসব alteration (পরিবর্তন) করেছে।

অন্তেবাসী — পনের বছর আগেও দেখেছিলাম পশ্চিমের দরজা, সিঁড়ির পাশে ঝাউ গাছ। এখন দেয়ালের গায়ে ক'টা মাত্র ঝাউ গাছ

রয়েছে।

শ্রীম — আর কিছুদিন পরে এসব রূপকথার মত হয়ে যাবে। কেউ আর থাকবে না বলবার।

অন্তেবাসী — ‘লিলি কটেজ’ও গার্লস স্কুল হয়েছে।

শ্রীম — এই সব modernised (আধুনিক কালের মত) হয়ে গেছে।

অন্তেবাসী — ও পাড়ায় আর কেউ আছেন (ঠাকুরের দর্শন করেছেন)?

শ্রীম —কোন্ পাড়ায়?

অন্তেবাসী — শোভাবাজার, বেনেটোলায়?

শ্রীম — অধর সেন আর নিতাইবাবু। নিতাইবাবুর বাড়ি ঠাকুর যান নি। নিতাইবাবু প্রায়ই যেতেন। খিলাত ঘোষের বাড়ি খুব বড় বাড়ি।

অন্তেবাসী — যতীনঠাকুরের বাড়ি কখন গিছলেন?

শ্রীম — শুনেছিলাম গিছলেন। কখন তার ঠিক নেই। যদু মল্লিককে বলেছিলেন, তুমি অত মোসাহেব রাখ কেন (হাস্য)? বলেছিলেন, শালার কাছে কলকে পাবার যো নেই। এই বলেই অন্য ঘরে চলে গেলেন। Within his hearing — শুনতে পায় এমনভাবে বলেছিলেন (হাস্য)।

(সহাস্যে) (যদু মল্লিক) খুব ভালবাসতেন ভেতরে ভেতরে তাঁকে। বিষয়কর্ম নিয়ে থাকায় বোঝা যেতো না।

অন্তেবাসী — তা না হলে তিনি (ঠাকুর) অত যেতেন কেন?

স্বামী রাঘবানন্দ — কাল আমরা গিয়েছিলাম মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি আর মনমোহনবাবুর বাড়ি, ইনি (অন্তেবাসী) আর আমি।

শ্রীম — মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি গৌর-নিতাই আছেন। সেখানে গিছলেন ঠাকুর।

স্বামী রাঘবানন্দ — মনমোহনবাবুর বাড়ি এখন একজন ঢাকার বাঙ্গাল কিনেছেন। উনি বললেন, এখানে বাহ্যে করে ঠাকুর অন্যত্র যেতেন।

শ্রীম — ওখানে বিশ্রাম করে অন্যখানে যেতেন।

সাধু ও ভক্তগণ তিনতলায় গেলেন। ঠাকুরঘরের সামনে বসিয়াছেন।

শ্রীম একটু পরে উপরে আসিয়া ছাদে একা বেড়াইতেছেন। একটু পর আসিয়া বসিলেন 'নাটমন্দিরে' ঠাকুরঘরের দরজার সামনে পশ্চিমাস্য। স্বামী রাঘবানন্দ বসিলেন উত্তরাস্য। আর অন্তেবাসী পশ্চিমাস্য। উভয়েই শ্রীম-র বাম হাতে। শ্রীম-র পরনে লালপেড়ে ধুতি, কোঁচান। গায়ে হাতকাটা সাদা ফতুয়া। তাহার উপর 'হরেকৃষ্ণ' নামাবলী। পোশাক ময়লা বলিলেই হয়।

শ্রীম কথামৃতের প্রুফ দেখিতেছেন, পঞ্চম ভাগের ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খণ্ড। শ্রীম-র সামনে চৌকো দোয়াত। হাতে কলম। দক্ষিণ হাঁটুর উপর ফর্মা রাখিয়াছেন। চোখে চশমা নাই। বিরলকেশ শীর্ষদেশ। আর আবক্ষ শ্বেত শ্মশ্রু। সমুখঠেলা উজ্জ্বল চক্ষুদ্বয়। প্রশস্ত উন্নত ললাট। প্রসন্ন গম্ভীর ভাব। যেন ব্যাস ঋষি বেদ প্রণয়ন করিতেছেন।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — এখন একটি ফটো নিলে হয়, শ্রীম কথামৃত লিখছেন।

অন্তেবাসী — এটা যদি প্রিন্ট অর্ডারের জন্য না হয়, তবে আমাদের দিন না। দেখে দেব'খন।

শ্রীম — না। কিছু addition alteration (অদল-বদল) করতে হচ্ছে।

প্রুফ দেখা হইয়া গেলে ফর্মাটা দিলেন স্বামী রাঘবানন্দের হাতে। বাগবাজারের সাহা ভক্তরা আসিয়াছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর নিরাকারের কথা বললেন নানকপন্থী সাধুদের। তাঁরা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন কিনা! ফরটি এইট এ্যাণ্ড হাফ ইয়ার্স আগে, এইটিন এইটিথ্রীতে। তখন আপনাদের কারও জন্ম হয়নি। ভবনাথকেও বললেন, ভক্তির কথা গান গেয়ে — 'শ্যাম তুমি আমার পরাণের পরাণ'। যার যেমন কলটি তেমনি নাড়া দিয়ে বাজিয়ে দিচেছন।

আবার বেদান্তবাদীদেরও বলতেন, তাঁদের মত করে। তাঁরা 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' বলেন — স্বপ্নবৎ সব।

(মুচকি হাস্যে সাধুদের লক্ষ্য করিয়া) যাদের ভক্তিভাব বেশী তাদের বেশী বেদান্ত শুনতে বারণ করতেন। বেদান্তবাদীরা স্বপ্নবৎ বলে কি না।

তাহলে গুরু উড়ে যাচেছ, অবতারও উড়ে যাচেছ। তাই ভক্তিচর্চা করতে বলতেন। দ্বৈতভাব থেকে আরম্ভ করতে বলতেন। তারপর যা দাঁড়ায় দাঁড়াক।

শ্রীম — (বালকের মত হাস্যানন্দে ফষ্টিনষ্টি করিয়া ভক্তদের প্রতি) আচছা, আপনাদের পাড়ায় আম উঠেছে?

একজন ভক্ত — পাবনাতে ছিলাম। সেখানে একশ আম দু আনা।

শ্রীম — আচছা, কোথায় আমে পোকা আছে (নয়নে হাস্য)? — ফুস্ করে উড়ে গেল (উচচ হাস্য)।

একজন ভক্ত — কুমারখালির আমে।

শ্রীম — (ঠাকুরঘরের দিকে দৃষ্টি করিয়া) — হাঁ সতীনাথবাবু, ফুল সাজানো হলো না?

সতীনাথ (ছাদে বসা, সেখান হইতে) — ও আমার কাজ নয়। জগদীশবাবু করবেন।

শ্রীম — না, জগদীশের আসতে দেরী হবে। তুমি করে ফেল। (শ্রীম-র চক্ষে হাসি, মুখেও ঈষৎ হাসি)। দম নিচিছলে বুঝি? (উচচহাস্য)।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — বলরামবাবু গাড়ি করে দিয়েছেন দেড় টাকায়। ঠাকুর বললেন, 'এত কমে হয়?' বলরামবাবু বললেন, 'তা অমন হয়।' ওমা, আধারাস্তায় যেতেই ঘোড়া থেমে দাঁড়াল। (ঠাকুর বললেন) 'কি রে থামলি যে?' না, 'ঘোড়ার পেট কামড়াচেছ' - সহিস বললে (হাস্য)। আবার চলছে, আবার থেমে গেল। (আবার ঠাকুর বললেন) কি হলো রে আবার?' 'না, এবার ঘোড়া দম নিচেছ' — সহিস বললে (সকলের অতি উচচ হাস্য)।

আর একদিন (বলরামবাবু) গাড়ী করে দিলেন। যেতে যেতে গাড়ীর ডানদিকটা খুলে পড়ে গেল সবটা — ঠাকুর গল্প করতেন। 'তখন ত্রৈলোক্য যাচেছ জানবাজারে জুড়ি গাড়ী করে। (বাঁ হাতে চোখ ঢেকে) লজ্জায় তখন হাত দিয়ে মুখ ঢাকি।' বলছিল, দম নিচেছ (হাস্য)।

শ্রীম (সতীনাথের প্রতি) — হাঁ, সতীনাথবাবু, ফাউটাউ দাও একটু। আবার তো আজ 'নিমাই সন্ন্যাস' দেখে পালাবে।

(ভক্তদের প্রতি) দুই দিন দেখেছে। আবার আজ হয়তো দেখে

পালাবে।

ভক্তগণ — কোথায়?

শ্রীম — উনি মাঝে মাঝে দেশে পালান।

জগদীশ আসিয়া ফল কাটিতেছে।

শ্রীম — জগদীশবাবু, দেখো হাত কেটো না। (ভক্তের প্রতি) আমরা একে মাঝে মাঝে বলি কিনা বড্ড slow (ঢিমে তেতালা), তাই তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে হাত না কেটে ফেলে (হাস্য)।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — কি অদ্ভুত way of criticism (সমালোচনার কি বিচিত্র রীতি)! মহাপুরুষদের পথই আলাদা। হাসি ঠাট্টার ভিতর দিয়ে hammering (উপলব্ধি) চলছে। ওরা (সেবকরা) টের পাচেছ না। অথচ কাজ ঠিক হয়ে যাচেছ!

শ্রীম (স্বগতঃ) — 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়া।' ভগবানের পথ ক্ষুরের ধারের মত। একটু এদিক ওদিক হলে অমনিই যাবে।

(বাগবাজারের ভক্তদের প্রতি) — আমি নববাবুকে বলেছিলাম, মেয়েদের এত ঘন ঘন না আনতে। মনে কর, এখানে পুরুষমানুষদের জায়গা। মেয়েদের এত কেন আসা? তবে একমাস পর একবার এলো, ঠাকুর প্রণাম করে যেতে পারে।

আর ছেলেদেরও বারণ করেছি আসতে। তাদের যখন সময় হবে তখন আসবে। এখন তাদের শরীর কিসে ভাল থাকে, আর পড়াশোনা করা। এঁরা এখানে তপস্যা করেন। তপস্যার বিঘ্ন হয় এতে। মেয়েরা দু'একমাস অন্তর এলো। ছেলেরা বেড়াচিছল। তা না করে এখানে বেড়াতে নিয়ে এল। এ ভাল না। তপস্যার বিঘ্ন হয় এঁদের। যা ভগবানের পথের বিঘ্ন তা (দু'হাতে ফেলার অভিনয় করিয়া) এমন করে ফেলে দেবে আর এগুবে।

একজন সাধু (স্বগতঃ) — যা বিঘ্ন, তা ফেলে দিতে হবে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ ছেড়ে নির্মমভাবে। প্রয়োজন হলে সমস্ত সংসার ছাড়তে হবে।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — 'আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে'। নিজের কি হলো এদিকে লক্ষ্য নেই। খালি লেকচার (পত্নী পুত্র কন্যার কাছে)। চাচা আপনি বাঁচা। আগে নিজে বাঁচ, তারপর অন্য।

'Physician, heal thyself' — চিকিৎসক, আগে নিজেকে আরোগ্য কর। তবে যদি তাঁর আদেশ পাও, লেকচার দাও। নচেৎ ‘আপনি শুতে স্থান পায় না শঙ্করাকে ডাকে’।

(সতীনাথকে লক্ষ্য করিয়া একজন সাধুর প্রতি) — কেউ খালি ধ্যান করতে চায় (হাস্য)। স্বামী বিবেকানন্দ একজনকে বলেছিলেন বরানগর মঠে, ‘ধ্যান করছিস্ কি রে, আগে তামাক সাজ’। এর নাম কর্মযোগ — তামাক সাজা (হাস্য)।

একজন সাধু — ত্রিগুণাতীত স্বামীকে।

শ্রীম — কে একজনকে।

৭

শ্রীম (জগদীশের প্রতি) — আম যা নরম হয়ে গেছে তা দিও ঠাকুরদের। উনি (স্বামী নিত্যাত্মানন্দ) জানেন, সাধুরা পাঠিয়েছেন।

মাদ্রাজের সালেম (Salem) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হইতে শ্রীম-র জন্য এক ঝুড়ি ভাল আম পাঠাইয়াছেন আশ্রমের মহন্ত স্বামী দেশিকানন্দ, আর যাঁহার সমস্ত সম্পত্তি দান করায় ঐ আশ্রম হইয়াছে, সেই বীর ভক্ত রাঘবন।

শ্রীম — সাধুরা পাঠিয়েছেন, মানে ঠাকুর পাঠিয়েছেন। অমূল্য জিনিস। তাই আমরা ঝুড়ির ভেতরে বড় একটা ন্যাকড়াতে বালিশের মত জড়িয়ে রেখেছি। ঐ দেখুন (নাটমন্দিরের ভিতরের ছাদে)। আমাদের যখন বৈরাগ্য হবে তখন মাথার বালিশ হবে এতে।

শ্রীম উঠিয়া ছাদে গেলেন। কেরোসিনের টিনে একটা বেলগাছ রহিয়াছে। গাছের গোড়ার মাটিতে কাল ডেয়ো পিঁপড়া অনেক গর্ত করিয়াছে। বহু পিঁপড়া গর্তে ঢুকিতেছে আর বাহির হইতেছে। শ্রীম সতীনাথ ও জগদীশকে ডাকিয়া নিয়া দেখাইলেন। বলিলেন, টিন থেকে মাটিশুদ্ধ গাছটা বের করলে হয়। ততক্ষণে অন্তেবাসী ছাদে গিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, দেখুন। আমি আর ভাবতে পারছি না। আপনারা চারজন আছেন, ব্যবস্থা করুন। প্রথম, একটি পিঁপড়েও মরবে না। সেকেণ্ড, গাছ রক্ষা হয়।

অন্তেবাসী নারিকেল পাতার কাঠি দিয়া গর্ত হইতে পিঁপড়া বাহির করিতেছেন। এক একটা গর্ত খালি হইতেছে আর অমনি মাটি দিয়া উহার মুখ বন্ধ করিতেছেন। শ্রীম দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন। একটু পর শ্রীম গিয়া 'নাটমন্দিরে' বসিলেন। স্বামী রাঘবানন্দের সঙ্গে কথামৃতের ফর্মার সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

অন্তেবাসী কয়েকদিন শ্রীম-র কাছে আছেন। আর ঠাকুরের স্থান সকল দর্শন করিতেছেন। সকালে বাহির হইয়া যান। ফিরেন বেলা বারটায়। শ্রীম উৎসুক চিত্তে বসিয়া থাকেন। উভয়ে আহার করেন। অন্তেবাসী তখন দিনের বিবরণ বলেন। আজের বিবরণ শেষ হইলে অন্তেবাসী শ্রীমকে বলিলেন, আজ মঠে যাইব। আবার কয়েকদিন পরে আসিয়া বাকীগুলি দেখিব।

শ্রীম বলিলেন, সেদিন বাগবাজারের খাল পর্যন্ত সব স্থানের কথা বলা হয়েছে। খালের উত্তর দিকেও অনেকগুলি স্থান আছে। (৫৩) কাশীপুর উদ্যান। (৫৪) সিঁতির বেণীপালের বাগান। (৫৫) সর্বমঙ্গলা। (৫৬) কাশীপুর শ্মশান। (৫৭) বরাহনগরে দশমহাবিদ্যা। (৫৮) 'ঠাকুরদাদার' বাড়ি। (৫৯) জয় মিত্রের ঠাকুর বাড়ি ও গঙ্গার ঘাট। (৬০) হরমোহনদের বাড়ি। (৬১) মণি মল্লিকের বাগান বাড়ি। (৬২) ভাগবত আচার্যের পাটবাড়ি। (৬৩) কাশীপুর বাগানের পাশেই মহিম চক্রবর্তীর বাড়ি — সেখানে গিছলেন কি? (৬৪) আলমবাজারে নটবর পাঁজার তেলের কল। (৬৫) শম্ভু মল্লিকের বাগান। (৬৬) যদু মল্লিকের বাগান। (৬৭) ঠাকুরের লীলাভূমি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ। (৬৮) এঁড়েদহে যোগীন স্বামীদের বাড়ি। (৬৯) কৃষ্ণকিশোরের বাড়ি। (৭০) গদাধরের পাটবাড়ি। (৭১) এঁড়েদহের গঙ্গার ঘাট — সাধুদর্শন করতে গিছলেন। (৭২) মতি শীলের ঝিলে নিয়ে গিছলেন একজনকে (শ্রীমকে) দেখাতে বেদান্তের ধ্যান, নিরাকারের ধ্যান কি করে করতে হয়। সেখানে বড় পুকুরে বড় বড় রুই মাছ ছিল। অনন্ত ব্রহ্মসমুদ্রে যেন মীন আনন্দে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে। (৭৩) পেনেটির উৎসবক্ষেত্র ও মণি সেনের ঠাকুরবাড়ি। (৭৪) রাঘব পণ্ডিতের ঠাকুরবাড়ি। সেখানে চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দও এসেছিলেন। (৭৫) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর বাইরে 'রস্‌কে'র বাড়ীতে গোপনে গিয়েছেন

রসিক কালীবাড়ির মেথর ছিলেন। কিন্তু ঠাকুরের ভক্ত। তার বাড়িতে গিয়ে চুল দিয়ে নর্দমা সাফ করে বলেছিলেন, 'মা, আমার ব্রাহ্মণ অভিমান চূর্ণ কর'। ঠাকুরের কৃপায় রসিক ঋষি। (৭৬) কামারহাটিতে ব্রাহ্মণীর (গোপালের মার) কুটীর। (৭৭) কোন্নগর। (৭৮) অম্বিকা কালনায় ভগবান বাবাজীর আশ্রম। (৭৯) নৈনানের ঠাকুরদের বাগানবাড়ি। এই বাড়িতে আর্য সমাজের প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ ১৮৭২-৭৩-এর ডিসেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের সঙ্গে দেখা করা ও ভারতের সমাজসংস্কার ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা ও কর্মপন্থা নির্ণয় করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই মিলনের। ঐ সময়ে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের মিলনসভাতে উপস্থিত ছিলেন। কার সঙ্গে তিনি এসেছিলেন তা সঠিক বলা কঠিন। তবে আমাদের (শ্রীম-র) নিকট কথাপ্রসঙ্গে ঐ মিলনের কথা ঠাকুর উল্লেখ করেছিলেন। এ 'কথামৃতে' বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, ঠাকুর হয়তো নেপালের রাজপ্রতিনিধি বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের সঙ্গে এসে থাকবেন। উপাধ্যায় মশায় মাঝে মাঝে ঈশ্বরীয় নাম উচচারণ করতেন — শিব, কালী, দুর্গা, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি। স্বামী দয়ানন্দ কৌতুকচছলে বলেছিলেন, 'আ রে সন্দেশ সন্দেশ কহো, কালী কালী না কহা কর।' উপাধ্যায় মহাশয় প্রায়ই ঠাকুরের কাছে আসতেন। খুব ভক্তিমান সেবক। কখনও নিজ বাসভবনে নিয়ে গিয়ে ঠাকুরকে আদরে ভোজন করাতেন। ইনিই কখনও বলতেন — 'আ রে, বাঙ্গালী মাণিককো (ঠাকুরকে) নহি পয়চানতা!'

ঠাকুর কেশব সেন ও স্বামী দয়ানন্দকে দেখে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এই অতিমানবীয় সমাধিদৃশ্যের প্রতি স্বামী দয়ানন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উপরোক্ত উপহাসের প্রত্যুত্তরে উপাধ্যায় মশায়ই সম্ভবতঃ স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করে থাকবেন, 'মহারাজ আপকো এইসি অবস্থা প্রাপ্ত হুই কেয়া?' স্বামীজী সহজভাবে উত্তর করলেন, 'নাহি, পাণ্ডিত্যাভিমান হ্যায়।' এই স্পষ্ট উক্তিই প্রতিপন্ন করে স্বামী দয়ানন্দ মহাপুরুষ ছিলেন। সর্বাবস্থায় সত্য কথা বলা মহাপুরুষের লক্ষণ। (৮০) ঠাকুরের মুখে শুনেছি, কলকাতায় এসে প্রথম লেবুবাগানে বড়দাদা পণ্ডিত রামকুমারের সঙ্গে ছিলেন। তখন বয়স ষোল বছর। এরপর আসেন বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে

খোলার বাড়িতে। পরে সেখানে হেয়ার প্রেস ছিল। (৮১) সুরেশ মিত্রের বাড়িতেও গিয়েছেন। ঐ বাড়িও ভাঙ্গায় পড়েছে বিপদাশঙ্কায়। রামবাবুর বাড়ির কাছে ছিল — অক্সফোর্ড মিশনের পেছনে। (৮২) কলুটোলায় কেশব সেনের বড় ভাই নবীন সেনের বাড়িতে গিছলেন তাঁদের মায়ের নিমন্ত্রণে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। আমরা risk (বিপদ) নিয়ে ঐ বাড়িতে নিচে বসে দ্বিতলের ঘরে ঠাকুরের নৃত্য দর্শন আর গান শ্রবণ করেছিলাম। ঠাকুর পরের দিন বলেছিলেন, 'গোপনে ভাল'। তিনি জেনেছিলেন, তাঁর অগোচর তো কিছু নেই। (৮৩) নকুড় বোষ্টমের মুদির দোকানে বসতেন, আমাদের ঠাকুরবাড়ির বিপরীত ফুটে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে। নকুড়, ঠাকুরের দেশেরই লোক। বলতো, ও বামুনঠাকুর গান শোনায়। ঠাকুর গানে মগ্ন। ওদিকে গামছায় বাঁধা চাল কলা ও ফল প্রভৃতি লোক সরিয়ে ফেলতো। এই পাড়ায় পূজো করতেন কিনা, সেখান থেকে এনেছেন। ঠাকুর হাসতে হাসতে গামছা ঝেড়ে চলে যেতেন। (৮৪) বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের বাড়িতে প্রায়ই নিয়ে যেতেন। (৮৫) বেলুড়ে নেপালের কাঠের টালে (depot) গিছলেন। গঙ্গায় ভাসিয়ে আনতো কাঠ। বিশ্বনাথ উপাধ্যায় নিয়ে গিছলেন। ঠাকুরের মুখে শোনা এই কথা।

অন্তেবাসী বিদায় লইতেছেন শ্রীমকে প্রণাম করিয়া। এখন বেলা সাড়ে আটটা বাজিয়াছে। শ্রীম বাগবাজারের ভক্তদের বলিলেন, আপনারা kindly (দয়া করে) এটা (কথামৃত পঞ্চম ভাগের ১৩-১৪ ফর্মা) সুধা প্রেসে দিয়ে যাবেন। অন্তেবাসী বলিলেন, আমায় দিন, আমি দিয়ে যাব। শ্রীম বলিলেন, না তোমায় আবার তা হলে হেঁটে যেতে হবে। এরাই নিক্। অন্তেবাসী বলিলেন, আমি আজ সিমলায় মনমোহনবাবুর বাড়ি আর মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি দর্শন করে যাব। তাই ঐ পর্যন্ত হেঁটে যাব। সুধা প্রেস তো রাস্তায় পড়বে। শ্রীম বলিলেন — আচছা, তা হলে নিয়ে যাও। রসিদের এখনই দরকার নেই। তোমার কাছে রেখে দেবে।

ভক্তরা অন্তেবাসীর সঙ্গে সুধা প্রেসে গেলেন। ফর্মা জমা দিয়া রসিদ লইয়া উহা ভক্তদের হাতে দিলেন, বিকালে তাঁহারা শ্রীমকে ফেরৎ দিবেন। রাস্তায় খুব উত্তম তালশাঁস আর কালজাম দেখিয়া অন্তেবাসী উহা মঠে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জন্য কিনিয়া লইলেন। তিনি পয়সা দিতে গেলে

ভক্তরা অনুরোধ করিয়া পয়সা দিলেন। ভক্তরা চলিয়া গেলেন।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত মনমোহন মিত্রের বাড়ি, ৬৪ নম্বর সিমলা স্ট্রীট ও সিমলা লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত। বাড়ির বর্তমান মালিক শ্রীভুবনেশ্বর গুপ্ত। পূর্ববঙ্গের লোক। ইনি কবিরাজ। ছোট দোতলা বাড়ি। গৃহকর্তা অন্তেবাসীকে লইয়া উপরে গেলেন। সিঁড়ির পাশের উপরের ঘরে ঠাকুর বসিয়াছিলেন। বলিলেন, শুনেছি যখনই তিনি আসতেন এই ঘরেই বসতেন। তাই ভাল করে রেখেছি। আরও বলিলেন — সিঁড়ি, উঠোন, নিম্নতলের বৈঠকখানা পুরোনো। বৈঠকখানা দুই ভাগে ছিল। এখন একটা ঘর করা হয়েছে। সিঁড়ির পাশে দেয়াল ভেঙ্গে রেলিং আমরা বানিয়েছি। ঘরে ঘরেই ঠাকুরের ছবি।

৪০।৪১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেনে মহেন্দ্র গোস্বামীর বাড়ি। উহা সিমলা স্ট্রীটের সামনের রাস্তা। এখন অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি। মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি অন্তেবাসীকে ভিতরে লইয়া গেলেন। বাড়িতে রাধাকান্ত মন্দির পশ্চিমমুখী। অন্তেবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, চৈতন্যদেবের বিগ্রহ কোথায়? নাতি উত্তর করিলেন, এখন সরিকের বাড়িতে গেছেন। এই পাশের ঘরে থাকেন এখানে এসে।

একটি বৃদ্ধা চেয়ারে বসা। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন অন্তেবাসী, হাঁ মা, ঠাকুরকে আপনি দর্শন করেছেন? অতি বিনীতভাবে তিনি উত্তর করিলেন, কি করে বলি বাবা দর্শন করেছি! এখানে আর যদু মল্লিকের বাড়িতে — দুই স্থানে দর্শন হয়েছে। ঠাকুরদালানের একটি পিলার দেখাইয়া বলিলেন, এখানে বসেছিলেন মেঝেতেই আসনে ঠাকুরের সামনে। অষ্টমী তিথিতে এসেছিলেন মনে আছে।

মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি অন্তেবাসীকে লইয়া এইবার ৪ ডবি, মানিকতলা স্ট্রীটে নীরদবিহারী গোস্বামীর বাড়িতে গেলেন। এই বাড়িতেই গৌর-নিতাই এখন পালায় আছেন। ঠাকুর এই বিগ্রহ যুগল দর্শন করিতেই আসিয়াছিলেন। অন্তেবাসী ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলেন। গোস্বামী বলিলেন, এই গৌর নিতাই পাঁচশ বছরের প্রাচীন। আমরা নিত্যানন্দ বংশ। খড়দহে আমাদের প্রাচীন বাড়ি। ‘পালা’-তে এখানে এসেছেন। নবদ্বীপ গোস্বামী আমাদের বংশধর। তিনিও ঠাকুরকে দর্শন করেছেন।

মহেন্দ্র গোস্বামীর নাতি বেশ উদার সরল লোক। বংশের ছাপ রহিয়াছে মনে। একটু স্থূলকায়। বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ। গলায় সোনার দড়ি। বক্ষে ললাটে ‘রাধাকৃষ্ণ’ নাম। গরদবস্ত্র পরিহিত। হাতে মালার আধারী — মুখে বিড়বিড় করিয়া জপ করেন।

গোস্বামীকে ধন্যবাদ দিয়া অন্তেবাসী পুনরায় আসিলেন মনমোহন গৃহে। গুপ্তমহাশয়ের নিকট বিদায় লইয়া বাসে উঠিলেন। কুঠিঘাটায় পার হইয়া এগারটায় মঠে।

আজই অন্তেবাসীর শেষ দর্শন শ্রীমকে। মনমোহন ও মহেন্দ্র গোস্বামীর ভবন দর্শনের বিবরণ শুনিবার জন্য তিনি আর এ শরীরে রহিলেন না। সঙ্কল্প ছিল, অন্তেবাসী আগামী সপ্তাহে আসিয়া এক সপ্তাহ থাকিবেন। কিন্তু শ্রীশ্রী ঠাকুর ইহার পূর্বেই স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ কলির বেদব্যাস ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত’কার আচার্য শ্রীমকে টানিয়া আপন কোলে স্থান দিলেন। অন্তেবাসীর নিকট শ্রীম-র এই শেষ বাণী।*

বেলুড় মঠ, কলিকাতার অদূরে।
২৮শে মে, ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ, শনিবার।

---

* শ্রীম কথিত উপরোক্ত দুই লিস্টে বর্ণিত ঠাকুরের শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র অধিকাংশ তীর্থসমূহ অন্তেবাসী একাধিক বার দর্শন করিয়াছেন শ্রীম-র সঙ্গে। এই শেষবার সঙ্কল্প ছিল প্রত্যেক স্থানের (১) প্রাচীন ঠিকানা (২) নূতন ঠিকানা (৩) শ্রীম-র মুখ হইতে ঠাকুরের দর্শনের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হইবে। কিন্তু অন্তেবাসীর এই সংকল্প পরিপূর্ণ হয় নাই। ইহার পূর্বেই শ্রীম ভক্তগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, ‘গুরুদেব, মা কোলে তুলে নাও’ — এই মহাবাণী বলিতে বলিতে মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন। ভক্তদের জন্য রাখিয়া গেলেন ঠাকুরের দিব্য জীবন ও মহাবাণী আর নিজের বিস্ময়কর গৃহস্থ সন্ন্যাসের অলৌকিক সংবাদ। ভক্তগণ এই অভয় ও আনন্দের সংবাদ অনুধ্যান করুন এবং ব্রাহ্মীস্থিতির দিকে অগ্রসর হউন, আর এই জীবননাটকের অন্তে ব্রহ্মলীনতা প্রাপ্ত হউন।

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

শ্রীশ্রীমর মহাসমাধি*

অন্তেবাসী

১

বেলুড় মঠ। শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘর। সকাল সাড়ে ছয়টা। ৫ই জুন, রবিবার, ১৯৩২। মহাপুরুষ মহারাজ খাটে বসিয়া আছেন পশ্চিমাস্য।

অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আজ আমি মাস্টার মহাশয়ের কাছে যাব মনে করেছি। দিন সাতেক থাকার ইচ্ছা। গত সপ্তাহে পাঁচ দিন ছিলাম। তাতে ঠাকুরের শ্রীচরণস্পর্শে পবিত্র কলকাতার পুণ্য স্থানসমূহ দর্শন করে একটা লিস্ট করেছি — মাস্টার মহাশয়ের সহায়তায়। আর এক সপ্তাহ চেষ্টা করলেই লিস্ট পূর্ণ হবে। অনেক স্থানে অদল বদল হয়েছে। ঘুরে ঘুরে দেখা। প্রাচীন ঠিকানা আর বর্তমান ঠিকানা ও বিবরণও লিপিবদ্ধ করা। অনেক সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণের অনুরোধে এ কাজে নেমেছি।

মহাপুরুষ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় কোথায় গিছিলে? বলিলাম, গত সপ্তাহে পঞ্চাশটা হয়েছে, পঞ্চাশটা বাকী আছে। এর ভিতর শ্রেষ্ঠ স্থান ঐ কলুটোলার হরিসভা — যেখানে ঠাকুর ভাবস্থ হয়ে চৈতন্যদেবের আসনে বসেছিলেন।

খুঁজতে খুঁজতে দৈবক্রমে ঠাকুরের ভক্ত কুঞ্জ মল্লিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কলুটোলা স্ট্রীটের দক্ষিণের গলিতে, মেডিক্যাল কলেজের ট্রপিক্যাল স্কুলের পেছনে। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আর বলতে লাগলেন, বাবা আমি হতভাগা। তাঁর এত

২১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল, ৪ঠা জুন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ।
শনিবার, ফলহারিণী কালিকা পূজার শেষ — অমাবস্যা, রোহিণী নক্ষত্র।

কৃপা পেয়েও সংসার ছাড়তে পারলাম না। কত ভালবাসা তাঁর। নিজহাতে রসগোল্লা মুখে তুলে দিয়েছিলেন। তখন আমার বয়স ষোল। তিন বার সব ছেড়ে বৃন্দাবনে গেলাম। সেখানে ঠাকুরবাড়ি আছে। কিন্তু তিনবারই আমায় বিষয়ে টেনে এনে এখানে ফেলেছে।

তোমাদের দেখে যেমনি আনন্দ হয়, তেমনি আমার দুঃখ হয় নিজের অদৃষ্ট দেখে। তোমরা এই যৌবন বয়সে সব ছেড়ে তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়েছ। কত ভাগ্যবান তোমরা! তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন কর নি — তাতেই এত ব্যাকুলতা! আমার দর্শন করেও কিছুই হল না।

তারপর আমার ঐ মহল্লায় আসার উদ্দেশ্যের কথা বললাম। তখন তিনি আমাকে হাতে ধরে নিয়ে গেলেন সেই চৈতন্যসভার স্থানে। স্থানটি তখন তাঁর ভাগনে পূর্ণ ধরের অধিকারে ছিল। পার্টিশান হয়ে যাওয়ায় একটু অদল বদল হয়েছে।

মহাপুরুষ শুনিয়া বলিলেন — হাঁ, চৈতন্যের আসনে ঠাকুরের বসা নিয়ে কলকাতার বৈষ্ণব সমাজে হুলুস্থুল হয়েছিল।

আমি বলিলাম, শ্রীম দুই তিন বার চেষ্টা করেছিলেন এই স্থান বের করতে। কিন্তু কৃতকার্য হন নি। আমার কাছে শুনে তিনি অনেক ভক্তের সঙ্গে গিয়ে ঐ স্থান দর্শন ও প্রণাম করে এসেছিলেন।

শ্রীম আমাকে বলেছিলেন, তখন বৈষ্ণব সমাজের শিরোমণি ছিলেন সিদ্ধ মহাপুরুষ ভগবানদাস বাবাজী। কাটোয়ায় তাঁর আশ্রম। তিনি কলকাতার বৈষ্ণব ভক্তগণকে কঠোর স্বরে তিরস্কার করলেন, কেন তোমরা ঐ আসনে বসতে দিলে? কেন বাধা দেও নাই?

শ্রীম বলেছিলেন, এই সব আন্দোলন একটু শান্ত হয়ে গেলে অন্তর্যামী ভগবান ঠাকুর হৃদয়কে নিয়ে নৌকা করে কাটোয়ায় ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন করতে গেলেন। তিনি নৌকাতে থাকতেই শুনেছি বাবাজী আশ্রমবাসীদের বলেছিলেন, আজ কোনও মহাপুরুষের শুভাগমন হবে এ আশ্রমে। হৃদয় মুখার্জী ঠাকুরকে ধরে নৌকা থেকে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

ঠাকুরের পরনে লালপেড়ে ধুতি, এলোমেলো ভাবে পরা। আর গা মোটা বোম্বাই চাদর দিয়ে ঢাকা ছিল। বাবাজী অতি বৃদ্ধ বলে তখন আসনে

শুয়েছিলেন।

ঠাকুর করজোড়ে তাঁর স্বভাবমত বাবাজীকে প্রণাম করলেন। হৃদয় বললেন, 'ইনি আমার মামা। আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন।' ঠাকুরকে নিচে মাদুরে বসালেন। দেখতে দেখতে ঠাকুর ভাবসমাধিতে নিমগ্ন হলেন। চোখ মুখ জ্যোতির্ময়। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ। গায়ের চাদর খসে পড়ল।

বাবাজী ঠাকুরের প্রশস্ত বক্ষঃস্থল লালিমারঞ্জিত দেখে বুঝতে পারলেন ইনিই সেই মহাপুরুষ যাঁর আগমনবার্তা ভগবান তাঁর হৃদয়ে পূর্বাহ্ণে সূচিত করেছিলেন। বাবাজী আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি উঠে এসে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন, কে এই মহাপুরুষ তা না জেনেই।

পরে হৃদয়ের নিকট থেকে পরিচয় পেলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরের রাসমণির কালীবাড়ির রামকৃষ্ণ পরমহংস। তখন আনন্দে উল্লসিত হয়ে শ্রদ্ধাপরিপূর্ণ হৃদয়ে বৈষ্ণবোচিত বিনয়ে হাত জোড় করে ঠাকুরকে বলতে লাগলেন, 'প্রভু, আপনি চৈতন্য-আসনে বসবার উপযুক্ত পাত্র। আমাদের কৃতার্থ করলেন। আমি ভক্তমুখে আপনার চৈতন্য-আসনে বসার কথা শুনে অতিশয় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। এখন আপনাকে দর্শন করে আমার সমস্ত সংশয় মিটেছে। বুঝেছি আপনিই শ্রীচৈতন্যদেব।'

এই কথা পরে বৈষ্ণবসমাজে প্রচারিত হলে তাঁদের শান্তি ও আনন্দ ফিরে এল।

মহাপুরুষ মহারাজ এই কথা শুনিয়া বলিলেন — দেখো, ভগবান নিজেকে নিজেই প্রচার করেন। মানুষ কিছু করতে পারে না। এই এত হুলস্থুল বৈষ্ণবসমাজে। আর সেই সমাজের প্রধান আচার্যের কি সশ্রদ্ধ মধুর ও দিব্য ব্যবহার! অবতার এলে তখন যথার্থ ভক্তের হৃদয়কুসুম প্রস্ফুটিত হয় আর মৌমাছির ন্যায় সকলে ঐ দিব্য অমৃত পানের জন্য ব্যাকুল হয়।

মহাপুরুষ মহারাজ — বেশ বেশ, ভাল কাজ। মাস্টার মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাবে।

অন্তেবাসী প্রণাম করিয়া চলিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ বলিলেন — হাঁ, আর বলবে, বিশ্বানন্দকে জেনেভায় ডেকেছে। উনি শুনলে খুশী হবেন। ওঁকে ভালবাসেন।

অন্তেবাসী পূর্ব দিকের ‘মহারাজের’ ঘরে প্রবেশ করিয়া সবেমাত্র বসিয়াছেন।

মহাপুরুষের অন্যতম সেবক স্বামী বৈরাগ্যানন্দ পূর্বদিকের বারান্দা হইতে বেগে প্রবেশ করিয়া আবেগভরে অন্তেবাসীকে বলিলেন — ও ভাই, সর্বনাশ হয়ে গেছে। অন্তেবাসীর হৃদয় এই কথা শুনিয়া কম্পিত হইল। অন্তরে তিনি বুঝিলেন, শ্রীম-র কিছু হইয়াছে। স্বামী বৈরাগ্যানন্দ আবার বলিলেন, মাস্টারমশায় আজ সকালে চলে গেছেন। অন্তেবাসী ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, বললেন কে? টেলিফোনে এইমাত্র খবর এসেছে, উত্তর করিলেন স্বামী বৈরাগ্যানন্দ।

অন্তেবাসী আফিসে ঢুকিলেন, দেখিলেন টেলিফোনের রিসিভার টেলিফোনের উপর নামান। পাশে বসা স্বামী রঘুবীরানন্দ।

অন্তেবাসী ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে ঐ সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি সংবাদ চাপিয়া বলিলেন, দ্বিজেন মহারাজ জানেন। উনি গেছেন সুধীর মহারাজের কাছে সোনার বাগানে।

অন্তেবাসী নিচে নামিলেন। মঠবাড়ির পশ্চিমের চায়ের বারান্দায় মণীন্দ্র ডাক্তার (স্বামী সদাত্মানন্দ) উপবিষ্ট। তাঁহাকে জিজ্ঞাসায় জানিলেন, এই যাচেছন দ্বিজেন মহারাজ।

সুধীর মহারাজ (স্বামী শুদ্ধানন্দ) থাকেন পাশের সোনার বাগানের দক্ষিণের ঘরে। সে ঘরে তিনি বিছানায় বসা। আশেপাশে বসা স্বামী দয়ানন্দ, অভয়ানন্দ ও আত্মবোধানন্দ। ঘরের দোরগোড়ায় স্বামী গঙ্গেশানন্দ (দ্বিজেন মহারাজ)। অতিশয় ব্যগ্রভাবে অন্তেবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাস্টারমহাশয়ের শরীর গেছে? উনি বলিলেন, যাও এখন যাও। উনি ঘরে ঢুকিলেন।

অন্তেবাসী কম্পিত হৃদয় লইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যে পায়খানার রাস্তায় ফুলবাগানের পাশে স্বামী জিতাত্মানন্দকে দেখিয়া বলিলেন, সর্বনাশ হয়ে গেছে। মাস্টারমহাশয়ের শরীর গেছে। বলো না এখন কাউকে।

গেস্ট-হাউসে আসিয়া অর্থ ও কাপড় লইয়া বাহির হইলেন অন্তেবাসী। বেলুড় গ্রামের ভিতর দিয়া বাজারে আসিয়া তিনি উঠিলেন হাওড়ার বাসে। তাহাতে বসা ব্রহ্মচারী যতীন। তিনিও যাইতেছেন ঠাকুরবাড়ি। আর

দেখিলেন, ভুবনেশ্বরের মণীন্দ্র মহারাজকে। উনি যাইতেছেন হাওড়া স্টেশনে পার্সেল আনিতে।

গেস্ট-হাউস ছাড়িবার সময় অন্তেবাসী বিমলকে (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) বলিলেন, তুমি বিকাশ মহারাজকে বলো আমি খাব না। আবার যখন আসবো তখন খাব। বিমল জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাচেছন, মাস্টার-মহাশয়ের ওখানে? অন্তেবাসী উত্তর করিলেন, হাঁ, সজীব নন। গতপ্রাণ মাস্টারমহাশয়ের কাছে বটে।

অন্তেবাসী নামিলেন হাওড়ায়। সেখানে ট্রাম ধরিয়া হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রীটের মোড়ে কৃষ্ণদাস পালের স্ট্যাচুর কাছে নামিলেন। হাঁটিয়া ঠনঠনে কালীবাড়ি হইয়া চলিলেন। গতরাত্রে ফলহারিণী কালীপূজা হইয়া গিয়াছে। এখনও ফুল ও পাতার সাজ রহিয়াছে।

শঙ্কর ঘোষের লেন দিয়া যাইতেছেন। মুড়ির দোকানের সামনে দুইটি স্ত্রীলোক আলাপ করিতেছে। করুণ স্বরে একজন বলিতেছে, বড় বিপদ হয়ে গেল এদের। আর একজন বলিতেছে — আহা, বলতে বিপদ! বছরটা না ঘুরে আসতেই আবার একটা বিপদ হলো। এই তো গেল বছর এই সময়েই ছোট ভাই (কিশোরী গুপ্ত) গেল।

অন্তেবাসীর আর সন্দেহ রহিল না। গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে পড়িতেই গলি দিয়া ঢুকিলেন ‘ঠাকুরবাড়ি’ (শ্রীম-র বাড়ি)। নিচে চৌকির নিচে জুতা রাখিয়া দোতলায় উঠিলেন। শ্রীম-র ঘরের সামনে গিয়া তিনি দেখিলেন ঘরে শ্রীম-র চারপাশে সব স্ত্রীলোক। সকলে কাঁদিতেছে। যতীন ঘরে ঢুকিয়া গিয়াছেন। পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

অন্তেবাসীও লোক ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া পদতলে বসিলেন। শ্রীম-র ধর্মপত্নী গিন্নী-মা, পুত্রবধূ, ভগিনী, নাতনী প্রভৃতি বহু আত্মীয়া চীৎকার করিয়া আর্তনাদ করিতেছেন। কেহ বাবা, কেহ দাদা, কেহ ভাই, প্রভৃতি আপন আপন সম্পর্ক ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন, আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশী ভালবাসতেন! এখন কে আর তেমন ভালবাসবে? সকলের মুখে এই একই কথা — আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশী ভালবাসতেন!

অন্তেবাসীর মনে একটি প্রশ্নের সঞ্চার হইল। কি করিয়া সকলে

এই একই কথা বলিতে পারে? সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মনে উত্তর আসিল, এতে আর অসম্ভব কি, আর আশ্চর্যই বা কি? শ্রীমকে দেখিয়াছি, তিনি প্রত্যেক মানুষের অন্তরস্থ অন্তর্যামী পুরুষ স্বীয় গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন ও প্রণাম করিতেন।

মানুষের স্থূল শরীরের ভিতর সূক্ষ্ম শরীর, সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর কারণ শরীর। কারণ শরীরের ভিতর মহাকারণ বা অন্তর্যামী পুরুষ। কেহ শ্রীমকে নমস্কার করার পূর্বে তিনি যুক্তকরে মানুষের হৃদয়স্থ ঐ অন্তর্যামী পুরুষকে প্রণাম করিতেন। তাঁহার কাছে অন্তরস্থিত সচ্চিদানন্দই শ্রীরামকৃষ্ণ। তাই সকলে আর্তনাদের সুরে সমস্বরে বলিতেছেন, আপনি যে আমায় সকলের চাইতে বেশি ভালবাসতেন!

নিজ চক্ষে আমি দেখিয়াছি এই দৈবী অভিনয়! শিশু পৌত্র ও দৌহিত্রদিগের সহিত যখন কথা বলিতেন, কি সশ্রদ্ধ, কি মিষ্ট, কি চিত্তাকর্ষক সেই সব কথা! মনে হইত, তিনি তাহাদের অন্তরমধ্যে অধিষ্ঠিত মহাকারণকে যেন কথা-পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিতেছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও এই কথাই আছে। উত্তম ভক্ত সর্বভূতে নারায়ণের অধিষ্ঠান দেখিতে পান এবং তাঁহাকে অন্তরে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করেন নমস্কার মুদ্রায়।

শ্রীম মেঝেতে শায়িত। ঘরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শির, আলমারির গায়ে চরণ, ঘরের পশ্চিমের দেয়ালের পাশে। অন্তেবাসী চরণ ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহার চক্ষে জল নাই, প্রবল শোকাগ্নিতে জল শুকাইয়া গিয়াছে।

অন্তেবাসী অনিমেষ নয়নে শ্রীম-র মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছেন। মন যেন স্তব্ধ ও স্তম্ভিত। খালি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন, আর দেখিতেছেনই ঐ দৈবী মুখকমল। দেখার শেষ নাই। চক্ষু অন্য দিকে নড়িতেছে না — অপলক দৃষ্টি ঐ চিরনিদ্রিত মহাসমাধিগত বদনকমলে। মনে হইতেছে, জীবিতকালে যেমন নিদ্রিতাবস্থায় ছিলেন এখনও তাহাই। নিঃশ্বাস বাধিত হইয়াছে, একথা মনে হয় না।

মুখমণ্ডলে মৃত্যুর কোনও লক্ষণ নাই — অর্ধ নিমিলিত নেত্র। দৈবী শিশু যেন মাতৃক্রোড়ে অক্লান্তভাবে শায়িত। মনের স্তব্ধতা ভেদ করিয়া এক একবার আশা হইতেছে, বুঝি আবার জাগ্রত হইবেন। পরক্ষণেই আত্মীয়গণের করুণ ক্রন্দনে ঐ আশা উন্মূলিত। শ্রীম গতাসু। তখনই সকল

বাঁধ ভাঙ্গিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ক্রন্দন বাহির হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে উঠিতেছে — হায়, কার কাছে এমন মধুর ঈশগুণগান শুনবো? কে আর অমন অযাচিত স্নেহে ভগবদংশ 'কথামৃত' পান করাবে? আমাদের জুড়াবার স্থান গেল।

এবার মনের সব বাঁধন ভাঙ্গিয়া গেল — বিচারের বাঁধন, লজ্জার বাঁধন, লৌকিকতার বাঁধন। অন্তেবাসী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতেছেন। পরিপূর্ণ জলাশয়ের বাঁধ ভাঙ্গিয়া জলরাশি বাহিরে আসিল। সামান্যই বাহিরে আসিল — অন্তরে সঞ্চিত শোকসাগর।

সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরিয়া কথামৃত বর্ষণ করিয়া এই 'শুভ্র জলধর' বিশ্রাম লইল। অথবা নারদ ঋষি যেন বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতে করিতে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন। অথবা রাজহংসের ন্যায় গান গাহিতে গাহিতে এই 'চাপরাশ-ধারী', 'ভাগবতের পণ্ডিত' যবনিকার অন্তরালে প্রয়াণ করিলেন। Certainly a magnificent close — সত্যই যেন মহান্ নাটকীয় পরিসমাপ্তি! 'গুরুদেব, মা, কোলে তুলে ন্যাও' — বলিয়াই একেবারে জগদম্বার ক্রোড়ে আরূঢ়!

চৈতন্যদলের লোক, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ — 'পুত্র' আজ পিতার কাছে চলিলেন, সচ্চিদানন্দধামে প্রয়াণ করিলেন।

নরকলেবরধারী আমাদের এ দৈবী রিসিভারটির অন্তর্ধান হইল। কাহার মুখে আর প্রবোধবাণী শুনিব? প্রকৃতির বিড়ম্বনায় তাপিত মনপ্রাণ কে সুশীতল করিবে সুস্নিগ্ধ হিমবারিসিঞ্চনে?

কি মহাপুরুষ! সংসারের কোন বন্ধনেই লিপ্ত নহেন। বিনির্মুক্ত হইয়া এই প্রায় অশীতি বর্ষ যাপন করিলেন। অসংখ্য তরুণ যুবককে সর্বত্যাগ করাইয়া ঈশ্বরের সাধনায় নিয়োজিত করিলেন — সর্বত্যাগীর ভেক ধারণ করাইয়া অগণিত সৎ গৃহস্থাশ্রমীকে সত্যের পথের, শান্তির পথের সন্ধান বলিয়া দিয়া বাউলের মত অন্তর্ধান হইলেন।

কি বিচিত্র মহাপুরুষ গৃহস্থাশ্রমী হইয়াও অত্যাশ্রমী! নতুবা তাঁহার প্রেরণায় যুবকগণ বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান পরিজন ছাড়িয়া কি করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন?

রাজর্ষি জনকের কথা পড়িয়াছি উপনিষদে। কিন্তু তাঁহার জীবনগতিক

বুঝিয়াছি কথঞ্চিৎ, শ্রীম-র জীবনধারা দেখিয়া।

শ্রীম-র কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া আমি আসি। তাহা দেখিয়া মঠের কোনও সাধুবন্ধু বলিতেন — কেন যাও ওখানে, মঠে ধর্ম হয় না? বন্ধুগণ, তোমাদেরও আর বলিতে হইবে না, আমাকেও আর শুনিতে হইবে না।

কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ সর্বদা শ্রীম-র নিকট যাইতে বলিতেন। কিছুদিন না গেলেই তিরস্কারের স্বরে বলিতেন, ওখানে তোমার যাওয়া উচিত। ওখানে ঠাকুরের ভাব মূর্ত।

উপনিষদের বালাকীর কথা তখন মনে হইত। জনকের কাছে লোক ছুটিয়া ছুটিয়া যায় জ্ঞান ভক্তি লাভের জন্য। তাহাতে দৃপ্ত ব্রহ্মজ্ঞ-অভিমানী বালাকী হন ঈর্ষান্বিত। তাই বলেন, লোক কেন অত 'জনকায় জনকায়' করিতেছে?

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীমকে তিনি চৈতন্যসংকীর্তনে দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীম কে? তিনি কি মুরারী গুপ্ত, যিনি 'কড়চা' রাখিয়াছিলেন? কিম্বা শ্রীবাস, যিনি অষ্টপ্রহর অবিরাম হরিনাম করিতেন? যাহার ধ্বনির অখণ্ড লহর আজও শ্রীনবদ্বীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে শোনা যায়।

স্কুলের বিষয়ে কিছুদিন শ্রীম-র সঙ্গে আমার বৈষয়িক ব্যাপারেরও সম্পর্ক হইয়াছিল। উনি মর্টন স্কুলের রেক্টর, আমরা শিক্ষক। সে ব্যাপারেও দেখিয়াছি অন্তরে ননীর মত হৃদয় রাখিয়া বাহিরে কর্মের ব্যাপারে, নীতিতে পর্বতের মত অটল, সিংহের মত বীর্যবান ও নির্ভয়!

শ্রীম-র অমানুষিক মেধা, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিদ্যা বিলীন হইয়া গিয়াছিল তাঁহার অলৌকিক জ্ঞান ও ভক্তির কাছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট একাধারে জ্ঞান ভক্তিই তাঁহার প্রার্থনা ছিল। তাঁহারই কৃপায় একাকাশেই সূর্য, চন্দ্রের উদয় হইয়াছিল একই সময়ে শ্রীম-র জীবনে - প্রহ্লাদের মত।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে শিখাইয়াছিলেন, গৃহস্থাশ্রমে জ্ঞানী হইবে শান্ত নিরভিমান। আর কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য। সাধু ভক্তের নিকট দাসানুদাস। আমোদ আহ্লাদে রসরাজ রসিক। শ্রীম-তে এইগুলির পূর্ণ বিকাশ দেখিয়াছি। অত গুণবান হইয়াও তাঁহার বাহিরের আচরণ ছিল যেন সাধু ও ভক্তের দাসানুদাস।

বৈষয়িক বিষয়ে মতান্তর হয়। শ্রীম-র সহিত বৈষয়িক বিষয়ে মতান্তর

কখনও থাকিলেও, মনান্তর কখনও হয় নাই। কারণ আমি বুঝিয়াছি, শ্রীম আমার পরম সুহৃদ, বন্ধু, পিতা, মাতা, গুরু, কর্ণধার।

শ্রীম-র আত্মীয়গণ কাঁদিতেছেন স্নেহে, সাংসারিক প্রীতি-সুখদাতা চলিয়া গেলেন বলিয়া, নিরাশ্রয় হইয়া। আমি কাঁদিতেছি কেন? মন তাহার উত্তর দিতেছে — তুমি কাঁদিতেছ তোমার পরমার্থলাভের গুরু আচার্য চলিয়া গেলেন বলিয়া। মানুষজীবনের যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ দান — ভগবানদর্শনের পথপ্রদর্শন — তিনি তোমাকে তাহাই দিয়া গেলেন। কেবল প্রদর্শন নয়, ঐ জ্যোতির সন্ধানপথে তুলিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর করাইয়া দিয়া গেলেন। কৃতজ্ঞতায় ভক্তিতে তোমার রোদন!

পরমপথে তুলিয়াছেন, ঐ পথের শান্ত আনন্দময় পথিকগণের সঙ্গলাভ করাইয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন, এই পথ ধরিয়া চলিতে থাক, সময়ে বাপ-মা আসিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন — নিশ্চিন্তে ও আনন্দে চলিতে থাক। যাহা কিছু মঙ্গলকর তাহা সমস্তই তিনি দিয়াছেন। কিন্তু নিজে একটুও দাবি রাখেন নাই। সদা বলিয়াছেন, সকলই ঠাকুরের দয়া, তাঁহার কৃপা!

কি আশ্চর্য, ইহাই কি অহৈতুকী কৃপা? এই স্বার্থহীনতা কি মানুষে সম্ভব?

হায়, আজ তিনি চলিয়া গেলেন — যিনি আমার ধর্মজীবনের পথপ্রদর্শক স্নেহময় পিতা, সন্তানবৎসলা মাতা, বিপদে বন্ধু ও সৎ পরামর্শদাতা। তিনিই আমার জীবনের highest ideal (সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ) ধরাইয়া দিয়াছেন।

বিগত যুগাধিক সময়ের সকল ঘটনা পরম্পরা চলচিচত্রের ছবির মত একে একে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত। কি দেখিতেছি শ্রীম-র এই সকল কার্য ও বাণীর ভিতর? কিসে আমরা ভগবানকে, শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া সংসারে থাকিতে পারি সদা এই চেষ্টা। বিষয়বিৎ পিতা যেমন পুত্রকে সকল বিষয়ের উপদেশ দিয়া শরীর ত্যাগ করেন শান্ত মনে, শ্রীমও সেইরূপ আমাদের সব দান করিয়া চলিয়া গেলেন — তবে এ অপার্থিব সম্পদ, পরমার্থ উপদেশ।

মিহিজামে আমাকে বলিয়াছিলেন, 'ডিমের অত ভাবনা কেন? মা জানেন কখন ফোটাতে হবে।' তাহার অর্থ এখন বুঝিতেছি। মা ডিম

ফুটাইয়া দিয়াছেন। ডিম জানিতেও পারে নাই এ কথা।

অবিরাম সমুদ্রপ্রবাহের মত শত শত শ্রীম-সম্পর্কিত সৎভাবনা আসিয়া মনে হাজির হইতেছে। তাহাদের স্রোত মাঝে মাঝে রুদ্ধ হইতেছে কেবল হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশক শোকের উচছ্বাসে। সংযমের বাঁধন ছিন্ন হইতেছে এক একবার।

এই শোকোচছ্বাস অধিকতর বর্ধিত হইতেছে যখনই দেখিতেছি আত্মীয়স্বজন, ভক্ত সাধুগণও রোদন করিতেছেন। তখনই মনে হইতেছে তিনি আর নাই এ জগতে। নচেৎ তাঁহার গুণসাগরে মন সদা নিমগ্ন। তিনি দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এ চিন্তার অবকাশ কোথায়? অতীত জীবনের সহস্র মধুময় স্মৃতিরসে মন নিমজ্জিত।

দলে দলে বেলুড় মঠের সাধু ও ব্রহ্মচারীগণ আসিতেছেন, সংখ্যাতীত কলিকাতা-নিবাসী ভক্তগণ আসিতেছেন, শ্রীমকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছেন। অন্তেবাসী তখনই বুঝিতেছেন শ্রীম গতাসু — তখনই তাঁহার প্রাণ ফাটিয়া ক্রন্দন দেখা দিতেছে।

পাশের ঘরে সাধুগণ অবিরাম কীর্তন করিতেছেন —

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন॥

কখন গাহিতেছেন —

এমন মধুমাখা হরিনাম নিমাই কোথা হ'তে এনেছে।
নাম একবার শুনে হৃদয়বীণে অমনি বেজে উঠেছে॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম, কভু ত এমন করেনি পরাণ,
আজ কি যেন কি এক নব ভাবোদয়, হৃদয়মাঝারে হ'তেছে।
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর, গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর,
আজ কি যেন কি এক উজল জগতে, আমায় নিয়ে চলেছে॥
আজ হ'তে নিমাই তোর সঙ্গে রব, জ্ঞানের গরব আর না করিব,
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে, নাচিতে বাসনা হ'তেছে॥
কে যেন কহিছে মোর কানে কানে, পারের উপায় হল এতদিনে,
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে, প্রেমের ঠাকুর এসেছে॥

একজন গাহিতেছেন —

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

কেহ গাহিলেন —

ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম,
অপূর্ব শোভন ভব-জলধির পারে, জ্যোতির্ময়।
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে।
কত যোগীন্দ্র ঋষি মুনিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর;
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভুগুণ-বন্দন;
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম॥

২

বেলা এগারটা। স্বামী প্রণবানন্দ নূতন গামছা গঙ্গাজলে ভিজাইয়া শ্রীম-র মুখ মুছিয়া দিলেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ একজোড়া গরদের কাপড় ও চাদর পাঠাইয়াছেন বেলুড় মঠ হইতে। উহা পরাইয়া দিলেন শ্রীমকে। তারপর ফুলের মালা চন্দন দিয়া সাজান হইল। পদ্মফুলের স্তূপ পড়িয়াছে। বহু গ'ড়ের মালা উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

স্বামী রাঘবানন্দ পঞ্চপ্রদীপের আরতি করিলেন প্রথম, তারপর কর্পুরের আরতি। সুগন্ধি ধূপে স্বামী প্রণবানন্দও আরতি করিলেন।

জার্মান ভক্ত মিস ফেপার ও নিবেদিতা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ব্রহ্মচারিণীগণ পুষ্পাঞ্জলি দিতেছেন, সাধুরাও দিলেন।

বাহিরে গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি নূতন শয্যা সাজাইয়া রাখা

হইয়াছে। একটি উত্তম নূতন খাট, তাহাতে চাঁদোয়া খাটান, নূতন তোষকের উপর চাদর, নিচে সতরঞ্জি, দুইটি কোলবালিশ — সকলই নূতন।

এবার নূতন একটি সতরঞ্জিতে শ্রীমকে শোয়ানো হইল। সাধুরা মরদেহ নিচে নামাইয়া আনিয়া ঐ খাটে শয়ন করাইলেন। এবার রাশি রাশি ফুলের মালা, অগুরু চন্দন পড়িতে লাগিল। শ্রীম-র জীবিতাবস্থায় কেহ কখনও তাঁহাকে এইরূপ রাজসিক শয্যায় শয়ন করিতে দেখে নাই।

'জয় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকী জয়' বলিয়া সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণ খাট স্কন্ধে তুলিলেন। মাথার উপরে জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্যকিরণ। কাহারও কোন হুঁশ নাই, সকলে নগ্নপদে চলিতেছেন।

বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের মোড়ে ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত, আর, মিত্রের বাড়ির কাছে গেলে শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস বলিলেন, 'মর্টন স্কুল হয়ে চলুন।' এই স্কুলের চারতলার ছাদে সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসরের উপর শ্রীম অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত বর্ষণ করিয়াছেন, যেন নৈমিষারণ্য। কত ভক্ত তৈয়ারী হইয়াছে। কতজনই তাঁহাদের সর্বস্ব ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়াছেন।

মর্টন স্কুলের অঙ্গনে খাট নামানো হইল। শ্রীম-র বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠা ভগিনী আসিয়া সজল নয়নে ভাইকে আলিঙ্গন করিলেন। প্রতিবেশীগণও আসিয়া দর্শন করিতেছেন।

খাট আবার সাধু ও ভক্তের স্কন্ধে আরোহণ করিল। আমহার্স্ট স্ট্রীট দিয়া উত্তর দিকে চলিতে লাগিল। যাইতে হইবে কাশীপুর শ্মশান ঘাটে, যেখানে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শরীর অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়।

খাটের পশ্চাতে সহস্র লোক চলিল। মানিকতলা অতিক্রম করিয়া বিডন স্ট্রীট দিয়া এই লোকসঙ্ঘ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে উঠিল। রাস্তার ট্রাম ও অন্যান্য যানবাহন কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হইয়া গেল । শত শত সাধু ব্রহ্মচারী ও গৈরিক বসনের মেলা দেখিয়া জনসাধারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, কথামৃত-রচয়িতা শ্রীম-র শরীর ত্যাগ হইয়াছে। কেহ কেহ এই কথা শুনিয়া এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিলেন নিজের কাজ ছাড়িয়া।

আগে শবাধার, তারপর কীর্তনদল, তারপর সাধু ভক্তগণ চলিতেছেন। কাশীপুরে টালার পুল পার হইয়াছে। শোভাযাত্রা একটি ছোট মসজিদের সামনে দিয়া চলিল, খোল করতালের বাদ্য বন্ধ হইল।

এবার উহা চলিয়াছে কাশীপুরের বাগানের পাশ দিয়া। এই বাগানেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। ভক্তগণ ও সাধুগণ শ্রীম-র শত স্মৃতির কথা স্মরণ করিতেছেন এই কাশীপুর উদ্যানের সহিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন শ্রীমকে, 'তোমরা রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে বেড়াবে বলে শরীর যাচেছ না। বল তো যায়।' আজ অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল পর শ্রীমও শ্রীগুরুর অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন কাশীপুর শ্মশানে।

রতনবাবুর গলি দিয়া শোভাযাত্রা প্রবেশ করিল কাশীপুর শ্মশানে। শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদীর পূর্ব পার্শ্বে দক্ষিণ শিয়র করিয়া খাট রাখা হইল। ভক্তগণ হাতপাখার হাওয়া করিতেছেন।

আবার লোকের ভিড়। 'কথামৃত'-রচয়িতা বলিয়া শ্রীম সুপরিচিত। দলে দলে লোক আসিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে লাগিল । বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন অনাথ আশ্রমের বালকগণ সারিবদ্ধ হইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কার্তিক মহারাজ হাতে হাতে পুষ্প দিতেছেন।

একটি সাধু শ্রীমকে দর্শন করিতেছেন খাটের চারিদিকে ঘুরিয়া। কখনও খাটের পূর্বদিকে দাঁড়াইয়া শ্রীম-র চিরনিদ্রায় শায়িত মুখমণ্ডল দর্শন করিতেছেন। কখনও উত্তর-পূর্ব দিকে দাঁড়াইয়া দর্শন করিতেছেন অনিমেষ নয়নে মশারীর চৌকাঠ ধরিয়া। আবার দেখিতেছেন পশ্চিম দিক হইতে খাটের পাশে বসিয়া। এক একবার শ্রীমুখে হাত দিয়া দেখিতেছেন। কখনও মুখমণ্ডলে হাত বুলাইতেছেন সস্নেহে। দুইটা মাছি মুখে বসিতে চেষ্টা করিলে তাহাদের তাড়াইয়া দিতেছেন। শ্রীম-র চক্ষুদ্বয় মহাসমাধিতে অর্ধনিমীলিত। ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত। কখন ওষ্টদ্বয় ফাঁক করিয়া দেখিতেছেন। একবার চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন নিচের দিকে তাহা কিঞ্চিৎ খোলা।

সাধুটি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন, দেখিতেছেন — দেখার শেষ নাই। ভাবিতেছেন, আর হয়তো ঘন্টাখানেক এ দেবশরীর দর্শন হইবে। তারপর পঞ্চভূতে মিলাইয়া যাইবে, যেখান হইতে উহা আসিয়াছিল। জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের আত্মা জীবিতাবস্থায় মুক্ত। যতদিন শরীর থাকে তাঁহারা জানেন স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীর —ইহার তিনটিই জামার ন্যায়, কোষমাত্র — সম্পূর্ণ পৃথক্। দেহাবসানে এই শরীর তাহাদের মূল প্রকৃতিতে বিলীন হইয়া যায়।

সাধুটির শরীর রুগ্ন ও ক্লান্ত। তথাপি সব ভুলিয়া ছায়ার মত শ্রীম-র চরণ-প্রান্তে দণ্ডায়মান। হৃদয়ে শোকাবেগ — হায়, আমাদের পরমার্থদাত্রী জননী চলিয়া গেলেন অমূল্য সম্পদ অমৃতের সন্ধান প্রদান করিয়া।

শ্রীম-র উজ্জ্বল, আনন্দময় ও প্রশান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া মঠের একজন বৃদ্ধ সাধু বলিলেন অপর সাধুদের, 'দেখ, দেখ। মুখের দিকে চেয়ে দেখ না একবার! কি দিব্যকান্তি! কত বড় মহাপুরুষ ইনি! বার ঘন্টা হয়ে গেল তবুও মুখমণ্ডল শিশুর মতন সরস সজীব, আনন্দে পরিপূর্ণ! যেন জীবিতাবস্থা থেকেও মহাসমাধিতে নিমগ্ন এই মহাপুরুষের মুখমণ্ডল অতিশয় প্রসন্ন ও আনন্দময়। মনে হচেছ ঠাকুর, মা এসে কোলে তুলেই নিয়েছেন। তাই তাঁদের দর্শনে শ্রীম-র মুখমণ্ডল দৈবী আনন্দে সমুজ্জ্বল।'

৩

শ্মশানের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ লোকাকীর্ণ। সাধু ও ভক্তগণ অনেকেই প্রশস্ত বেদীর উপর — কেহ বসিয়া, কেহ অর্ধশায়িত। কেহ কেহ শোকার্ত হৃদয়ে একাকী আনমনে বিচরণ করিতেছেন। কেহ কেহ পরস্পর বলিতেছেন — হায়, আমাদের আশ্রয়স্থলটি গেল। কেহ পায়ে আলতা মাখাইয়া শ্রীচরণচিহ্ন লইতেছেন কাপড়ে।

বেলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। অনেকেরই হুঁশ নাই। তাই কেহ কেহ সাবধান করিতেছেন শ্রীম-র চিতা তৈরী করিতে। সাধুদের মধ্যে কার্যক্রম লইয়া মতভেদ হইতে লাগিল। একবার স্বামী প্রণবানন্দ ও স্বামী কৈবল্যানন্দ (যোগী মহারাজ) বেশ একটু উষ্ণভাব ধারণ করিলেন।

শুদ্ধ গব্যঘৃতে এইবার শ্রীম-র সমস্ত শরীর অবলেপন করা হইল। তারপর কয়েকজন সাধু ও ভক্ত নূতন সতরঞ্জিতে শয়ান করাইয়া শ্রীমকে শেষবারের মত গঙ্গাস্নান করাইতে সিঁড়ি দিয়া নিচে নামাইয়া নিলেন। গঙ্গার জলে বেশ করিয়া স্নান করাইয়া উপরে তুলিতেছেন। এবার উত্তর দিকের দেওয়ালের ফাঁক দিয়া সকলে উঠিলেন। একটি সাধু সর্বদা শ্রীম-র শিরটি সযত্নে রক্ষা করিতেছিলেন।

স্নানের পর গৌরবর্ণ শরীর আরও উজ্জ্বল ও অধিক শ্রীমান হইল। শ্রীম তেল মাখিয়া স্নান করিতে ভালবাসিতেন। মিহিজামে একটি ভক্তকে

জোর করিয়া তেল মাখিয়া স্নান করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। নিজহস্তে ভক্তের হাতে তেল ঢালিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেশব সেন তেল মাখতেন। স্বামী বিবেকানন্দও তেল মাখতেন।'

শ্রীমকে শেষে কঠিন শয্যায় শায়িত করিলেন। একজন ভক্তের প্রাণ হু হু করিয়া উঠিল। শ্রীম সর্বদা কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন। কারণ, শরীর অতি সুকোমল। ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষদের শরীর তুলার মত কোমল। শিয়র উত্তর দিকে — শ্রীশ্রী ঠাকুরের বেদীর গায়ে ঠাকুরের চরণতলে। উপরে নিচে পাশে রাশীকৃত চন্দনকাষ্ঠ রক্ষিত হইল। তারপর প্রচুর ঘৃত ঢালিয়া দেওয়া হইল।

পুরোহিত যথাশাস্ত্র পিণ্ড প্রদান করাইলেন শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রভাস গুপ্তের হাতে। সাধু ও ভক্তগণ ধূপ ও কর্পূর দিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠরাশির ভিতর দিয়া আলতায় রঞ্জিত পদযুগল আবার দর্শন করিতেছেন একটি ভক্ত।

প্রভাসপ্রমুখ কুটুম্বগণ প্রদক্ষিণ করিয়া মুখে অগ্নিসংযোগ করিলেন। একটি ক্ষীণ জ্বলন্ত পাটকাষ্ঠ শ্রীম-র দক্ষিণ দিকের সুগুচছ শ্বেত শ্মশ্রু দগ্ধ করিতে লাগিল। ভক্তের কোমল হৃদয় ইহা দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

অগ্নি দাউ দাউ করিয়া প্রজ্জ্বলিত। সাধু ভক্তগণ সম্মিলিত কণ্ঠে 'হরি ওঁ রাম রাম' মহামন্ত্র উচচকণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন।

একটি ভক্ত দৌড়াইয়া গিয়া বেদীর অপর পার্শ্বে লুক্কায়িত হইলেন। যতক্ষণ শরীর ছিল ততক্ষণ আর এদিকে চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। শ্রীম-র মহাসমাধির পরের চারিটি দৃশ্য তিনি মনে মনে দেখিতেছেন। প্রথমটি, ঠাকুরবাড়ির মেঝেতে শয়ান ছবি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্মশানে ও খাটে শায়িত। আর একটি, শেষশয্যায়।

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ রুদ্রযাগের বৈদিক মন্ত্র বেদধ্বনিতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন চিতার পাশে দাঁড়াইয়া।

বেলুড় মঠ হইতে দলে দলে সাধু ব্রহ্মচারীরা নৌকা করিয়া আসিতে লাগিলেন। এক নৌকায় আসিলেন স্বামী কৈলাসানন্দ, ঈশানন্দ প্রভৃতি। অপর এক নৌকায় আসিলেন কয়েকজন সাধু ও মঠের ভৃত্যগণ।

গতরাত্রিতে ফলহারিণী কালীপূজা গিয়াছে। সাধুরা তাই উপবাস ও

দারুণ গ্রীষ্মে ক্লান্ত। কেহ বেদীতে শুইয়া আছেন। কেহ কেহ তৃষ্ণানিবারণার্থ জল খাইতেছেন।

বেলা ছয়টা বাজিয়াছে। চিতাগ্নি প্রবল বেগে জ্বলিতেছে। পট্ পট্ শব্দে উপরের অশ্বত্থ বৃক্ষের পত্রসমূহ দগ্ধ হইতেছে। সাধু, ভক্ত ও আত্মীয়গণ মাঝে মাঝে হাতাতে করিয়া ধূপ, অগুরু, গুগ্‌গুল ও চন্দনকাষ্ঠ 'ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিতেছেন।

সাধুগণ কেহ কেহ বিদায় লইতেছেন। কেহ বা বেদীর উপর বসিয়া বিরাট অভাবের কথা ভাবিতেছেন। প্রবীণ ভক্ত বড় জিতেন বলিতেছেন — ভাই জগবন্ধু, বড়ই ফাঁকা ঠেকছে। উত্তর আসিল, এই সবে আরম্ভ হল। আরও ফাঁকা ঠেকবে।

কেহ শ্রীম-র গুণগান করিতেছেন। স্বামী কমলেশ্বরানন্দ বলিতেছেন, 'আপনারা সকলে পায়ের ছাপ নিন। অমন মহাপুরুষ হয় না। নখ চুল আছে কি?' অন্তেবাসী বলিলেন, 'ডাক্তারবাবু এসব জানতেন। উনি এসব রেখেছিলেন।'

ভগবান সূর্যদেব অস্তাচলে গমন করিলেন। ধীরে ধীরে সন্ধ্যার ছায়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিল। গঙ্গায় গমনাগমনশীল জাহাজ ও নৌকাগুলিতে আলো জ্বলিয়া উঠিল। অপর পাড়ের বৈদ্যুতিক আলোগুলি যেন নিরাশার অন্ধকারে আশার আলোর মত আজ অধিকতর সুমধুর লাগিতেছে।

যোগী মহারাজ হীরেন মহারাজকে বলিলেন, 'এইবার হাত দিন। বাকী কার্যটি সমাপন করে ফেলুন।' বিক্ষিপ্ত অগ্নিসমূহকে একত্রিত করিয়া তাহাতে আরও ঘৃতাদি আহুতি দেওয়া হইল।

রাত্রি আটটা। এবার অগ্নি প্রায় নির্বাপিত হইল। প্রথমে পাঁচটি ডাবের জল উহার উপর সিঞ্চন করিয়া দেওয়া হইল। তারপর প্রচুর দধি দিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান করিলেন হীরেণ মহারাজ। সাধুরা সমস্বরে বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন —

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

এইবার নূতন কলসী করিয়া একের পর আর গঙ্গাজল আহুতি দেওয়া হইল। চিতাগ্নি প্রশান্ত।

দিবাভাগেই বেলুড় মঠ হইতে মঠাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, অস্থি যেন মঠে লইয়া আসা হয়। তাই দুইটি নূতন তাম্রপাত্র আনা হইয়াছে। বিনয় মহারাজ, হীরেন মহারাজ ও বলাই অস্থির বড় বড় টুকরা সব বাছিয়া লইতেছেন। তারপর গঙ্গামৃত্তিকার একটি ক্ষুদ্র বেদিকা রচনা করিলেন। তাহার চারিদিকে একটি বেড়া দেওয়া হইল। ইতিপূর্বেই ভক্তগণ কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমতি লইয়াছেন এই স্থান রক্ষার জন্য।

বিনয় মহারাজ ও বলাই গঙ্গাজলে সব অস্থিখণ্ডগুলি ধুইয়া আনিলেন। শ্মশানপ্রাঙ্গণের উত্তরাংশের ইষ্টকাসনে বসিয়া অস্থি নূতন বস্ত্রে মুছা হইতেছে। তারপর উহা উক্ত নূতন পাত্রে রাখা হইল।

একজন সাধু ক্ষুদ্র একখণ্ড অস্থি খাইয়া ফেলিলেন। অপর একখণ্ড বিনয়কে দিলেন। উনিও খাইলেন। উহা চীনদেশীয় প্রথা। অতি প্রিয়জনেরাই এইরূপ আচরণ করেন। ঐ সাধুটি শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের (স্বামী শিবানন্দ) মুখে একদিন শুনিয়াছিলেন এইরূপ, ‘ঠাকুরের একখণ্ড অস্থি স্বামীজী খেয়ে ফেললেন। আমাকেও দিলেন একখণ্ড। আমিও খেলাম। তারপর দুজনে ধ্যান করতে লাগলাম। স্বামীজীর সমাধি হয়ে গেল।’

সাধুও অস্থির টুকরা খাইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ ধ্যানের পর নিম্নরূপ ভাবলহরী আপনি মনে উঠিল।

অসীম অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগর। ঠাকুর তাহাতে সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। আমরাও, ঠাকুরের সন্তানগণও ঐরূপ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীমও তাই, সেইরূপ সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। শ্রীম-র পাঞ্চভৌতিক দেহ শেষ হল আজ। এখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট সচ্চিদানন্দঘন দেহে বিরাজমান। এবার সদানন্দে আছেন।

শ্রীম-র স্থূল শরীরটি আমাদের নিকট একটি divine message receiver-এর (দৈববাণীর গ্রাহকযন্ত্র) মতো ছিল এতদিন। আবার ঐ যন্ত্রে দেববাণীর ব্রডকাস্ট হতো সাধু ভক্তগণের নিকট। আজ এটি শেষ হল। স্থূলে আর পাওয়া যাবে না। সূক্ষ্মরূপে অবশ্য সর্বদাই থাকবেন। ভাগ্যবানই কেবল ঐ বাণীর অধিকারী।

এইবার ঠাকুরের সন্তানগণের সূক্ষ্ম ও আমাদের সকলের সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় দেহগুলি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীরামকৃষ্ণে একীভূত হল। কেবল দেশহীন কালহীন অনন্ত সচ্চিদানন্দ সাগর। আমি মীন হয়ে ঐ সাগরে মহানন্দে ছুটাছুটি করছি। কোটি কোটি চন্দ্র সূর্যের জন্ম হচ্ছে ঐ সাগরে। আমি চেষ্টা করছি এই সাগরকে প্রশান্ত উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রূপেই কেবল দর্শন করি। কিন্তু তাতে তরঙ্গ দেখা যাচ্ছে। মনে ভাবছি, এই তরঙ্গ কি আমার মনের বাসনার চঞ্চলতার জ্ঞাপক?

এইরূপ একটি প্রশান্ত উজ্জ্বল ও আনন্দময় ভাবে মনটি আমার ডুবিয়া গেল। ভাবিতেছি, তবে কি করিয়া শ্রীম আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইবেন? তাহা হইবার যো নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আমরা সকলেই চিরবিদ্যমান সদানন্দে।

বাহ্য জগতে যেন শ্রীম-র শরীর ত্যাগের পাঁচ দিন পূর্বের অবদান শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাক্য সর্বদা স্মরণ থাকে — 'মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর যেন তোমার মহামায়ায় মুগ্ধ না হই।'

সাধু ও ভক্তগণ শ্মশানভূমিকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া বিদায় লইতেছেন। স্বামী জিতাত্মানন্দ, স্বামী নিত্যাত্মানন্দ, স্বামী ধর্মানন্দ, হীরেন মহারাজ, উপুদা মহারাজ, ভগবান পাখোয়াজী ও সতীনাথ বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। কলিকাতায় গেলেন সাধুরা কেহ কেহ, ভক্তগণ আর প্রভাসাদি শ্রীম-র কুটুম্বগণ। শ্রীম-র দ্বিতীয় পুত্র চারু কলিকাতার বাহিরে ছিলেন। তিনিও সংবাদ পাইয়া শ্মশানে আসিয়াছেন, তখন সব শেষ।

সাধুরা নৌকায় বসিয়া গাহিতেছেন, 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ'। নৌকা মধ্যগঙ্গায়। ঘটি দুইটি পূর্ণ হইলে অবশিষ্ট অস্থি অন্তেবাসী ও স্বামী জিতাত্মানন্দ অঞ্জলি করিয়া তিনবার 'ওঁ হ্রীং, শ্রীরামকৃষ্ণায় পরব্রহ্মণে স্বাহা' বলিয়া গঙ্গাজলে বিসর্জন করিলেন।

৪

রাত্রি নয়টা। বেলুড় মঠের ঘাটে নৌকা থামিল। অস্থিপাত্র দুইটি শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে ঠাকুরঘরে রক্ষিত হইল।

পরের দিন সকালে যথারীতি মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে

গেলেন অন্তেবাসী সকলের শেষে। গতকাল সারাদিন কাশীপুর মহাশ্মশানে থাকার পরিশ্রমে শরীরের অসুস্থতা ও শ্রীম-র অন্তর্ধানের শোকের ব্যথায় শরীর মন উভয়ই অবসন্ন ছিল। তাই গেস্টহাউসের উপরের হল হইতে নামিয়া ধীরে ধীরে মঠবাড়ির দ্বিতলের পশ্চিমোত্তর কোণের মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গেলেন। মনে জোর টানিয়া আনিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁহার খাটের উত্তরাংশে বসিয়াছিলেন, মন অন্তর্মুখ। শ্রীম-র অন্তর্ধানে তাঁহার মনেও বিরাট আঘাত লাগিয়াছে। ঠাকুরের ভক্তদের দেখিতেছি তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখের বাণীর ‘কলমীর দল’ই বটে। একখানে টান পড়িলে বিরাট দলেই টান পড়ে। মহাপুরুষ মহারাজ শুনিয়াছি, আজ সকাল হইতে শ্রীম-র গুণগাথা কীর্তন করিতেছেন।

অন্তেবাসী লুকাইয়া প্রণাম করিয়া পূর্ব পাশের ‘মহারাজে’র ঘরে প্রবেশ করিলেন অতি তাড়াতাড়ি, যেন মহাপুরুষ না দেখিতে পান। অন্তেবাসীর এইরূপ করিবার কারণ এই ছিল, মহাপুরুষ মহারাজের সামনে শ্রীম-র বিয়োগব্যথার উপর স্থাপিত সংযমের বাঁধ যাহাতে ভাঙ্গিয়া না পড়ে। শেষ অবধি এই প্রচছন্নভাবে প্রণাম প্রকাশ হইয়া পড়িল। মহাপুরুষ মহারাজ সেবক হীরেন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে গেল? জগবন্ধু মহারাজ, সেবক উত্তর করিলেন। তাঁকে ডাক, শ্রীমহাপুরুষ বলিলেন।

আসিয়াই অন্তেবাসী পুনরায় প্রণাম করিয়া খাটের পাশেই নিচে মেঝেতে বসিলেন, সংযমের বাঁধ সামলাইয়া। কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য হইলেন না। নয়ন হইতে অশ্রুবিসর্জন হইতে লাগিল। মহাপুরুষ মহারাজ প্রবোধ দিয়া বলিলেন — বাবা, এ সব ঠাকুরের শরীর। তাঁর কাজের জন্য এসেছিলেন। কাজ ফুরিয়েছে। তিনি আবার কোলে তুলে নিলেন। তাঁর শরীর গেছে বটে। আলমারীর ভিতরের ‘কথামৃত’গুলির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, এইগুলি তাঁর অমর কীর্তি ঘোষণা করবে সর্বকাল। যাবৎ চন্দ্র সূর্য উঠবে তাবৎ শ্রীরামকৃষ্ণের নাম জীবন্ত থাকবে। আর সেই সঙ্গে থাকবে কথামৃতের লেখক শ্রীম-র নাম। শরীর তো আজ আছে, কাল নেই। ঠাকুরই চলে গেলেন! শ্রীম-র যাওয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের ক্ষতি অপূরণীয়। কলকাতার লোকদেরও প্রভূত ক্ষতি হল। বেদব্যাস ও নারদের ন্যায় একটি উজ্জ্বল মণি অন্তর্হিত হল।

এসব কথা ভেবে মনে শান্তি আনতে চেষ্টা কর। তিনি এত দীর্ঘকাল যা শিখিয়েছেন তা পালন করতে চেষ্টা কর। ঠাকুরের চিন্তায় ডুবে যাও। এটাই মানুষজীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এটাই থাকবে। আর সব যাবে। শোক পরিহার কর। আনন্দ কর এই ভেবে যে তোমরা অতি সৌভাগ্যবান, যে অবতারের পার্ষদদের ভালবাসা পেয়েছ। ধন্য তোমরা।

মহাপুরুষ মহারাজের কাছে বসিয়াই অন্তেবাসী ভাবিতে লাগিলেন আর একটি কথা, দুই বৎসর পূর্বের। অন্তেবাসী তাঁহার সেবাকর্মস্থল দেওঘরের শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে যাইতেছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করিতে তিনি তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলা নয়টা। মহাপুরুষ অসুস্থ হাঁফানীর প্রবল আক্রমণে। তাঁহার চরণস্পর্শ করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া অন্তেবাসী বাহির হইতেছেন। তখন তিনি বলিলেন — বাবা, তুমি বাবা বৈদ্যনাথের নিকট প্রার্থনা করে বলবে, এই শরীরটা দিয়ে যদি আরও কাজ করাতে হয় তবে যেন চলনসই রাখেন। বড় যন্ত্রণা রোগের! অসহ্য যন্ত্রণা! যদি চলনসই না রাখেন তবে যেন তাঁর কোলে উঠিয়ে নেন।

অন্তেবাসী আবার রওনা হইয়াছিলেন 'আজ্ঞে আচছা' বলিয়া। মহাপুরুষ মহারাজ পুনরায় বলিয়াছিলেন, যন্ত্রণায় উচচারণ অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন, আর ও শরীরটার জন্যও। ইশারায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন শরীরটা? অন্তেবাসী বলিলেন, মাস্টার মশায়ের। হাঁ, হাঁ — এ সবই তাঁর শরীর। কষ্ট না দেন বেশী। বলিয়াছিলেন, তুমি নিত্য বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে যাবে। আর আমার জন্য আর মাস্টার মশায়ের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে বাবা বৈদ্যনাথের চরণে।

অন্তেবাসী পুনরায়, 'আজ্ঞা হাঁ' বলিয়া বিদায় লইলেন। দুই বৎসর পূর্বের এই কথা আজ তাঁহার মনে উদিত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার কল্যাণের জন্যই নিত্য মন্দিরে যাইতে আদেশ করিলেন। নচেৎ তাঁহাকে দিয়া তাঁহাদের শরীরের জন্য প্রার্থনা করার কি প্রয়োজন? বাবা বৈদ্যনাথই তো ঠাকুরের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া আনিয়াছেন জগতের শিক্ষার জন্য। অন্তেবাসী ভাবিতে লাগিলেন, একজন তো কাল চলিয়া গেলেন। তাঁহার জন্য প্রার্থনা করা বন্ধ হইল। মন্দিরে যাইব নিশ্চয়।

মহাপুরুষের জন্য প্রার্থনা করিব।

অন্তেবাসী প্রতিদিন অপরাহ্ন ছয়টা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত এই মন্দিরে থাকিতেন। জল ঝড় বৃষ্টি যাহাই হউক না কেন, সাপ ও হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ অন্ধকার রাত্রের বাধা না মানিয়া। কোথা হইতে তাঁহার এই মনের বল আসিল? উত্তরে বলিতে হয়, মহাপুরুষ মহারাজেরই আশীর্বাদে, আর তাঁহার উপদেশে।পূর্বে একদিন বলিয়াছিলেন, বৈদ্যনাথ বড় জাগ্রত স্থান! এটা সিদ্ধ যোগপীঠ! একবার বাবা বৈদ্যনাথ কৃপা করে দর্শন দিয়েছিলেন ওখানেই, বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠার সময়। হাঁফানী খুব বেড়ে গিছল। যন্ত্রণায় ছটফট করছি। সেই সময়ে বাবা কৃপা করে দর্শন দেন, আর সব যন্ত্রণা ভুল হয়ে যায়। তাই বলি সেখানে নিত্য যাবে। ওটি জাগ্রত ও জীবন্ত মহাপীঠ! দেবীরও একান্ন পীঠের মধ্যে এটি হৃদয়পীঠ।

পরদিন শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূজার সঙ্গে শ্রীম-র অস্থিও পূজিত হইল। তারপর মহাপুরুষ মহারাজেরই আদেশে স্বামীজীর মন্দিরে ঐ অস্থির ভাণ্ডদ্বয় স্বামী নিত্যাত্মানন্দ ও স্বামী জিতাত্মানন্দ কর্তৃক শিরে ধারণ করিয়া নীত হইল। ওখানেই শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ইচ ছায় এই সাধু দুইজন নিত্য অর্ঘপ্রদান করিতে লাগিলেন। অপরাপর মহাপুরুষ গণের অস্থির সহিত উহাও ঐ মন্দিরে নিত্য পূজিত হয়।*

---

* ইদানীং এসব অস্থি বেলুড় মঠে নূতন মন্দিরের দ্বিতলে স্থাপিত।

পরিশিষ্ট

দ্বিতীয় অধ্যায়

শ্রীম-র মহাসমাধি — অব্যবহিত পূর্বের ঘটনাবলী

অন্তেবাসী

১

কলিকাতা। মর্টন স্কুল। ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটের চারতলার নিজকক্ষেই শ্রীম বাস করিতেছেন। পরিবারবর্গও এই বাড়ির ত্রিতলে। গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ। মর্টন ইনস্টিটিউশান উঠিয়া গিয়া কয় বছর এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউশান হইয়াছে। গ্রীষ্মের দারুণ গরমে চারতলার ছাদে থাকা কষ্টকর। শ্রীম মাঝে মাঝে দুই একদিন আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাড়ির চারতলাতেও থাকেন, সেখানে রাত্রে প্রচুর হাওয়া মিলে।

পরিজনদের সঙ্গে থাকিলেও হাঙ্গামা পোহাইতে হয়। তাই শ্রীম সারাটা গ্রীষ্মকালই একরকম ঠাকুরবাড়িতে রহিয়াছেন। 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগ ছাপা হইতেছে। সাধু ও ভক্তগণও কেহ কেহ সঙ্গে থাকেন। অন্তেবাসী কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠ হইতে আসিয়া শ্রীম-র সঙ্গে ঠাকুরবাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন।

কয়দিন পূর্বে অন্তেবাসীকে বলিয়াছিলেন, sights and scenes (স্থান ও দৃশ্যাবলী) যথাসম্ভব change (পরিবর্তন) করা উচিত। ঠাকুরবাড়িতে প্রায় তিন মাস হয়ে গেল। তাই দিনকয়েক মাঝে মাঝে স্কুলবাড়িতে থাকার চেষ্টা। সারাটা গ্রীষ্মই এখানে কেটে গেল। ছোট বাড়ি, হাওয়া কম। গ্রীষ্মে বড় কষ্ট হয়। তা ছাড়া তেমন কষ্ট আর কি?

৩রা জুন শুক্রবার, ২০শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯ সাল। সকালে শ্রীম স্কুলবাড়িতে আসিয়াছেন। নিচের ঘরগুলি ঠাণ্ডা — বিশেষ করিয়া সিঁড়ির পাশের ঘর। ঐ স্থানে থাকিবেন দুপুরে, মনে করিয়াছেন। রাত্রিতে ছাদের ঘরে। ঘরের বেঞ্চিগুলি টানাটানি করিয়া একদিকে সরাইয়া রাখানো হইয়াছে। বেলা প্রায় দশটায় শ্রীম স্নান করিয়া ঠাকুরবাড়িতে যান। আবার বিকালে বেলা চারটার পর আসেন। প্রায় তিন ঘন্টা মর্টন স্কুলে ছিলেন। সন্ধ্যা

সাড়ে সাতটায় ফিরিয়া যান ঠাকুরবাড়ি। ফিরিবার সময় সিটি কলেজের কাছে ক্লান্ত হইয়া রাস্তায় বসিয়া পড়েন। দৌহিত্র হুলো ছিল সঙ্গে। সে রিক্সা আনিতে যাইতেছিল। তাহাকে মানা করিলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঠাকুরবাড়ি পৌঁছোন।

ঠাকুরবাড়িতে আরতি হইতেছে। 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' গাওয়া শেষ হইল। রাত্রির শীতল-ভোগের অবকাশ দশ মিনিট। তারপর হয় 'ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্য' ও 'সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে'। তারপর হয় পর পর রামনাম —

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম।
জয় জয় মঙ্গল সীতারাম॥ ইত্যাদি
কনকাম্বর কমলাসনজনকাখিল ধাম।
সনকাদিক মুনিমানসসদনানঘ ভূম॥ ইত্যাদি
আর্তানামার্তিহন্তারং, ভীতানাং ভয়নাশনম্।
দ্বিষতাং কালদণ্ডং তং, রামচন্দ্রং নমাম্যহম্॥ ইত্যাদি

যখন 'ভয় হর মঙ্গল' হইতেছিল তখন শ্রীম তিনতলায় ঠাকুরঘরে আসিলেন। একটু থাকিয়াই দ্বিতলে নিজকক্ষে চলিয়া গেলেন আর শুইয়া পড়িলেন। আরতি শেষ হইল আটটায়।

রাত্রি ৮ - ৯॥

এখন রাত্রি আটটা। বড় জিতেন অমৃতি পাঠাইয়াছেন ঠাকুরের ভোগের জন্য। ভোগ হইয়া গেলে শ্রীম-র আদেশে সব অমৃতি তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন। সতীনাথ একখানা রাখিয়া বাকী সব দ্বিতলের ঘরে শ্রীম-র কাছে আনিলেন। ঐখানা রাখিয়াছেন স্বামী রাঘবানন্দের জন্য। শ্রীম শুনিয়া বলিলেন — হাঁ, সাধুর জন্য রাখা ঠিক। শ্রীম রসিকতা করিয়া সতীনাথকে বলিলেন, তোমার জন্যও একখানা রাখা হয়েছে।

শ্রীম বলিলেন স্বামী রাঘবানন্দ ও সতীনাথকে, আপনারা গদাধর আশ্রমে যাচেছন তো? ওখানে সারারাত কালীপূজা হবে — ফলহারিণী কালীপূজা। আবার মুক্তিক্ষেত্র কালীঘাট। খুব দিন আজ। ঐ এক রাতে হাজার বছরের তপস্যা হয়ে যায়। আসুন আপনারা এইবার, রাত হয়ে গেছে।

তাঁহারা উভয়ে শ্রীম-র অভিপ্রায়ে ভবানীপুর গদাধর আশ্রমে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে একটু পর আসিলেন অমৃত গুপ্ত। তখন হইবে রাত্রি নয়টা। শ্রীম তিনতলায় উঠিলেন। ঠাকুরঘরের দেয়ালে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিলেন। ঘরে ব্রহ্মচারী বলাই ঠাকুরের শয়ান দিতেছেন। মায়ের মশারি খাটাইতেছেন। শ্রীম প্রণাম করিয়া ছাদে গেলেন। নিকেলের চশমা হাতে। উহা চোখে লাগাইয়া বাহিরে নগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। আকাশের নক্ষত্ররাজি দর্শন করিতেছেন। চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীম তিনতলায় সিঁড়ির কাছে আসিয়া দক্ষিণ দিকের একটি বাড়িতে বিবাহসজ্জা দর্শন করিতেছেন। নানা রঙের বাল্ব দিয়া আলোকিত করিয়াছে ছাদের উপর, হোগলার মণ্ডপের ভিতর। বালকের ন্যায় সব দর্শন করিতেছেন। তাঁহার মনে কি উদিত হইয়াছে চিরবিদায়ের ভাবনা? কে জানে? মাঝে মাঝে অমৃতের সঙ্গে রঙ্গরসও করিতেছেন এই বিবাহোদ্যোগ দেখিয়া। শ্রীম নিজের ঘরে দ্বিতলে নামিয়া আসিলেন। অমৃত বিদায় লইলেন। এখন সাড়ে নয়টা।

২

রাত্রি ৯৷৷—১০৷৷

বলাই ঠাকুরদের শয়ান দিয়া শ্রীম-র কাছে আসিয়াছেন। শ্রীম একটু পূর্বে আহার করিতে বসিয়াছেন। ভোজ্য দ্রব্য যথারীতি — বাজারের দুইখানা পাঞ্জাবী রুটি ও আধসের গাঢ় গরুর দুধ। তরকারিও মাঝে মাঝে একটু চাটনীর মত মুখে দিতেছেন। প্রসাদী ল্যাংড়া আম কখনও এক আধটা খাইতে ভালবাসেন। আহার শেষ করিয়া বাহিরে আসিলেন হাত ধুইতে। বলাই হাতে জল ঢালিয়া দিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, তুমি আছ জানলে ডাকতাম খাবার সব এগিয়ে দিতে। শ্রীম এরূপ করেন না। আজ হয়তো অতিশয় ক্লান্তি বোধ করিয়াছেন। হাত ধুইয়া ঘরে গিয়া নিজের বিছানার উপর খাটে বসিলেন। বলাই উচ্ছিষ্ট সব পরিষ্কার করিলেন।

শ্রীম বলিলেন, হ্যারিকেনটা দাও, টেবিলে রাখবো — প্রুফ দেখতে হবে। কথামৃতের প্রুফ দেখিতে বসিলেন পঞ্চম ভাগের চতুর্দশ ফর্মা। ঠাকুর

ভগবানকে একটি গান গাহিয়া বলিতেছেন, 'শ্যাম তুমি আমার পরাণের পরাণ'। শ্রীম-র এই শেষ প্রুফ দেখা।

গত বৃহস্পতিবার রাত্রি একটা পর্যন্ত জাগ্রত থাকিয়া কথামৃতের পঞ্চম ভাগের শেষ ফর্মার লেখা শেষ করিয়াছেন। তাহার কোথাও কোথাও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়াছেন।

রাত্রি এখন পৌনে দশটা। বলাই বাড়িতে যাইতেছেন কালী সিং-এর লেন, মেছুয়াবাজারে। শ্রীম বলিতেছেন, এখন আমায় একলা থাকতে হবে। আবার না গেলে তোমার খাওয়া হয় না। আচ্ছা, বাইরের দরজা বন্ধ করে দাও। না, যদি আমার কিছু বিপদ হয় তবে কি করে লোক আসবে? বলাই বলিলেন, ভিতরের দরজা বন্ধ করে যাব চৌকাঠের উপর চাবি রেখে। ফটক খোলা থাকবে। তা হলে দরকার হলে বাইরে থেকে খুলে লোক আসবে। বলাই বিদায় লইলেন।

বলাই আহার করিয়া ঠনঠনে কালীবাড়িতে ফলহারিণী কালীপূজা দর্শন করিয়া সাড়ে দশটায় ফিরিয়া আসিলেন ঠাকুরবাড়ি।

সাধু ভক্তেরা অনেকেই আজ দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠে গিয়াছেন। মঠ হইতে অন্তেবাসী, যোগী মহারাজ ও বিমলকে (পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) সঙ্গে লইয়া আজ অপরাহ্নে খেয়া পার হইয়া কুঠিঘাটে জয় মিত্রের বাড়ি ও ঘাট, মণি মল্লিকের বাড়ি, যদু মল্লিকের বাড়ি প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণরেণুপূত তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া দক্ষিণেশ্বর গিয়াছিলেন। রাত্রে যোগী মহারাজ কালীপূজা দর্শনের জন্য ওখানে রহিয়া গেলেন। অন্তেবাসী ও বিমল বালির পুল পার হইয়া মঠে হাঁটিয়া আসিলেন। রাস্তায় বৃষ্টি হইল।

এদিকে ঠাকুরবাড়িতে বলাই আসিয়া দেখিলেন, শ্রীম মশারীর ভিতর নিদ্রিত। একতলায় ভিতরের দরজার কাছে একটা হ্যারিকেন জ্বলিতেছে আর একটা শ্রীম-র ঘরের বাহিরে দেয়ালে। বলাই তিনতলায় নাটমন্দিরে বিছানা করিয়া ছাদে গিয়া বসিয়া আছেন। জপ করিতেছেন। পাঁচ মিনিট পরই শ্রীম-র উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনিতে পাইলেন — বলাইবাবু, বলাইবাবু। বলাই আসিয়া অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিলেন। শ্রীম তাঁহার ঘরের দরজার পাশে বারান্দায় শৌচে বসিয়া আছেন। কঠিন নীতিপরায়ণ শ্রীম-র পক্ষে এ আচরণ অতীব বিপরীত ও স্বভাববিরুদ্ধ।

বলাই বুঝিলেন, শ্রীম-র শরীর আকস্মিক বেদনায় জর্জরিত ও চলচ্ছক্তিহীন। নিরুপায় অবস্থায় এইরূপে মলত্যাগ করিতেছেন। দূর হইতে তাঁহাকে শ্রীম বলিলেন, একটা মাটির ভাঁড় নিয়ে আসুন। বলাই নিচতলা হইতে ভাঁড় লইয়া আসিলে তাঁহার নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া নিজেই মল উহাতে উঠাইতে লাগিলেন। বলাই ঐ ভাঁড়টা বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। রাত্রি এখন এগারটা।

রাত্রি ১১—১২টা

শ্রীম নিজের ঘরের দরজার চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া আছেন দক্ষিণমুখী বালিশে মাথা রাখিয়া এবং দেওয়াল ও চৌকাঠের উপর হেলান দিয়া। কিছুক্ষণ পরে ঘরের ভিতর মুখ করিয়া উত্তরমুখী হইয়া ঐ ভাবে বসিলেন। পা দুখানি ঘরের ভিতরে পিঁড়ার উপর। বলাইকে হাতে ধরিয়া আছেন। প্রায় একঘন্টা এইরূপ রহিলেন। বলিলেন — বাঁ হাতে সেঁক দাও, খুব বেদনা। বলাই ঐ অবস্থায় শ্রীমকে ধরিয়াই হাতের কাছে যাহা ন্যাকড়া পাইলেন হ্যারিকেনে তাহা গরম করিয়া সেঁক দিতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ভক্তগণ আজ কোথায়? শ্রীম অসুস্থ হইয়া আশে পাশে অনেক ভক্ত দেখিলে খুশি হন। শরীর অনবরত ঘামে ভিজিয়া যাইতেছে। বলাই মাঝে মাঝে মুছিয়া দিতেছেন। শ্রীম আবার বলিলেন — আচ্ছা, সিদুকে ডাক!

সিদু উত্তর দিকের বাড়িতে থাকেন। বলাই বার বার ডাকিয়াও কোন সাড়া পাইলেন না। ইহা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা নিশুকে ডাক। নিশুর বয়স পঞ্চাশ হইবে, একটু স্থূলকায়। পাশের বাড়িতেই থাকেন। মাঝে মাঝে ছাদে বসিয়া ধ্যান করেন। নিশু উত্তর দিলেন। বলাই বলিলেন, এঁর অসুখ বেড়েছে, অমিবাবুকে খবর দিন। অমিবাবু আসিলেন। ইনি শ্রীম-র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত কিশোরীবাবুর পুত্র। গত বৎসর এই দিনে কিশোরীবাবু শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। অমিবাবু একটা সোডা ওয়াটারের বোতল লইয়া আসিলেন। শ্রীম-র গা-বমি গা-বমি করিতেছে। এটা খাইলে যদি উহা বন্ধ হয়, তাই সবটাই খাইয়া ফেলিলেন। বলিলেন, এখন যদি বমি হয় তা হলে শরীর থাকবে না। ঈশ্বরেচ্ছায় বমি হইল না।

অমিবাবু ইতিমধ্যে ৫০ নম্বর আমহার্স্ট স্ট্রীটে মর্টন স্কুলে গিয়া শ্রীম-র জ্যেষ্ঠপুত্র প্রভাসবাবুকে সংবাদ দিয়া আসিলেন। বাড়ির ঝি শ্রীমকে শ্রদ্ধা করিত। সে সংবাদ পাইয়া সর্বাগ্রে দৌড়িয়া আসিল। তারপর বোঁচা আর হুলোকে (শ্রীম-র পৌত্র ও দৌহিত্র) সঙ্গে লইয়া আসিলেন প্রভাসবাবু। এবার সকলে মিলিয়া সেবা করিতেছেন। কেহ হাওয়া করিতেছেন, কেহ সেঁক দিতেছেন, কেহ শরীর মুছাইয়া দিতেছেন।

এইবার শ্রীম বলিলেন, আমাকে মেঝেতে শুইয়ে দাও। ঘরের খাট বাহির করিয়া সাদা কম্বল পাতিয়া পূর্বমুখী করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। মাথাটি বালিসে ঠেস দিয়া রাখিয়াছেন। বলাইকে পাশে থাকিতে বলিলেন। যন্ত্রণা বাড়িতেছে ছট্‌ফট্ করিতেছেন। এখন রাত্রি একটা।

রাত্রি ১- ৩টা

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছেন — দুই হাতের কনুইয়ের কাছে দারুণ ব্যথা। এক একবার প্রার্থনা করিতেছেন — মা, অজ্ঞান করে দাও। আর কাজ করবো না, মা। আর কাউকে কিছু বলবোও না, মা। অজ্ঞান করে দাও, মা। মাঝে মাঝে আবার প্রার্থনা করিতেছেন, গুরুদেব, মা কোলে তুলে ন্যাও।

কয়েকদিন পূর্বে অন্তেবাসীকে বলিয়াছিলেন, এখন তিনি (ঠাকুর) বলছেন, বসে বসে তাঁর নাম কর। আর নানান্‌খানা ভাবতে দেবেন না। কিন্তু শ্রীম কর্মবিরত মোটেই হইতেন না। বরং বেশী কাজ করিতেন। পঞ্চম ভাগ শেষ করিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে লাগিয়াছেন। ভক্তগণ কেহ কেহ তাঁহার সহিত সহযোগ করিয়া বিরক্ত হইয়া পড়িতেছিলেন।

অন্তেবাসীকে আরও বলিয়াছিলেন, ‘একটা কাজ মাথায় ঢুকলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত শান্তি নেই’। বাড়ির তিনতলায় নর্দমা মেরামত তখন হইতেছিল। উহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, ‘দেখ, রাত একটা দুটো থেকে ঘুম নেই। ভাবছি, ঠিক হলো কিনা।’ অন্তেবাসী বলিলেন, তাহলে কেন কাজ করেন? এইরূপ অনুযোগ করিলে শ্রীম বলিয়াছিলেন, ‘প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি’। আর দৃঢ়তর ভাবে অনুযোগ করিলে বলিতে লাগিলেন —

'ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে।।' (গীতা ৪-১৪)

আবার —

যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতুঃ কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।। (গীতা ৩-২৩)

আর —

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্মচেদহম্।.. (গীতা ৩-২৪)

বেদনা বুঝি এবার আর থামিবে না, শরীরও থাকিবে না। ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিল। আবার ভক্তরাও সব কাছে নাই একজন ছাড়া। শরীর আর থাকিবে না বলিয়াই বুঝি ভক্তদের সকলকে দূরে পাঠাইয়া একা রহিলেন। কয়েকদিন পূর্বেই সুখেন্দুকে ঘরে গিয়া বিশ্রাম লইতে পাঠাইয়া দিলেন। মনোরঞ্জনকেও তাহাই করিলেন। ইঁহারা সর্বদা কাছে থাকিতেন।

আজও স্বামী রাঘবানন্দ, সতীনাথ প্রভৃতিকে অন্যত্র কালীপূজা দেখিতে পাঠাইলেন। শুনিতে পাই মহাপুরুষরা একা একা থাকেন মহাপ্রয়াণের সময়। স্বামীজীও একা ছিলেন, কেবল একটি মাত্র সেবক ছিলেন কাছে। ভক্তের ভালবাসাও বন্ধন। উহা ছিন্ন না হইলে যাইতে পারেন না। তাই সকলকে না বলিয়া যেন একা মহাপ্রস্থান করেন।

ভক্তদের অবোধ মন বলিতেছে, যদি অনেক লোক থাকতো আর সময়ে সেবা হতো তাহলে হয়তো শরীরটা রক্ষা হতো। গত বৎসরও এইসময় বেদনা হয় মর্টন স্কুলে। বহু ভক্ত ও সাধু উপস্থিত থাকায় উপযুক্ত সেবায় শরীর রক্ষা হয়ে গেল। ঠাকুরের ইচ্ছাই প্রবল। তিনি প্রিয় সন্তানকে আর দুঃখক্লিষ্ট ধরাধামে রাখবেন না, তাই এবার কোলে তুলে নেবেন।

শ্রীম মাঝে মাঝে বলিতেছেন, মা অজ্ঞান করে দাও। অজ্ঞান হয় রোগযন্ত্রণায়, ঔষধ প্রয়োগে অথবা মৃত্যুতে, কিংবা মহাসমাধিতে। ঠাকুর রোগযন্ত্রণা নিরোধ করিলেন বটে একটু পরেই, কিন্তু তাহা মহাসমাধিতে। জগতের লোক আর শ্রীমকে দেখিতে পাইল না।

বড়ই যন্ত্রণা। ছট্‌ফট্ করিতেছেন, কখনও উঠিয়া বসিতেছেন, কখনও শুইতেছেন। কখন পাশে ফিরিয়া বালিশে মাথা গুঁজিয়া রাখিতেছেন। কখনও বলাইয়ের কাঁধে মস্তক রক্ষা করিতেছেন। কখনও যোগাসনে বসিতে

চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু তীব্র বেদনা বাধা দিতেছে। কখনও সামনে ঝুঁকিতে চাহিতেছেন, তাহাও পারিতেছেন না। হার্ট আক্রমণ করিয়াছে বেদনা। একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণায় এক একটি মুহূর্তও যেন সহস্র যুগের মত কাটিতেছে।

হার্টের আক্রমণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। তাই একটু উপু হইয়া দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন। ধীরে ধীরে শরীরের অপরাংশ হইতে বেদনা হৃদয়ে গিয়া পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ঘাম হইতেছে অনবরত, আর গায়ে জ্বালা হইতেছে। অমি বলিলেন, একটু চা খান। শ্রীম তাহা খাইবেন না। আবার অমি বলিলেন, তবে গরম মিছরীপানা দি? শ্রীম তাহাতেও রাজী হইলেন না। শুধু গরম জল দিতে বলায় তাহাই খাইলেন। এখন রাত্রি আড়াইটা। সমস্তটা মেঝেতে গড়াগড়ি দিতেছেন যন্ত্রণায়। খালি গা। কিছুক্ষণ পর বলিলেন, ‘গা ঢেকে দাও’। একটা কাপড় দিয়া শরীর আবৃত করা হইল।

ভোর রাত্রি এখন চারটা। ডাক্তার ধীরেনবাবু আসিলেন। তিনি আধখানা বড়ি দিলেন। শ্রীম খাইলেন না। অত যন্ত্রণায়ও বাহ্যজ্ঞান পূর্ণ মাত্রায় রহিয়াছে। ছেলেমানুষ পৌত্র দৌহিত্রদের নিদ্রাবিষ্ট দেখিয়া শ্রীম বলিলেন, ‘যাও তোমরা শোও গে। তোমাদের কষ্ট হচেছ।’ সারাজীবন শ্রীম কাহারও সেবা লন নাই। অপরের কষ্ট হইতেছে দেখিয়া অত যন্ত্রণার ভিতরও কিন্তু শ্রীম-র মনে যাতনা হইতেছে।

এখন ভোর প্রায় পাঁচটা। গিন্নী-মা স্কুলবাড়ি হইতে আসিয়াছেন তিনি আসিবার পর একবার মাত্র প্রস্রাব করিলেন। ইহার পরই বলিতেছেন, ‘বিছানা করে শুইয়ে দাও।’ তোষক পাতিয়া বিছানা করিয়া শোয়াইয়া দিলেন। সওয়া পাঁচটার সময় হঠাৎ বমি হইল মেঝেতে, পূর্ব দিকের দরজার কাছে। ইহার পরই শরীর ক্রমশঃ হীনবল হইতে লাগিল। দুইবার সামান্য কফসংযুক্ত থুথুও ফেলিলেন। ছটফটানি কমিয়া আসিতেছে — স্থির শান্ত ভাব ধারণ করিতেছে দেহ ক্রমশঃ। বেশ প্রশান্ত ভাব। মুখশ্রী উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। উৎক্রমণ করিতেছে প্রাণ। শ্রীম বলিলেন, ‘শরীর আর থাকবে না’। বাঁ কাতে শুইলেন।

পাঁচ মিনিট বাকী প্রায় সমাধির। শ্রীম স্পষ্ট স্বরে, প্রশান্তভাবে বলিতে লাগিলেন —

‘গুরুদেব, মা, কোলে তুলে ন্যাও।’

ব্যস্, এই শেষ কথা শ্রীম-র মর্ত্যধামে। কথার মত কথা বটে! এই কথাটি অন্তিম সময়ে বলিবার জন্যই অত সাধন ভজন, জপ তপ।

তিন মিনিট মাত্র বাকী। এক একবার ওষ্ঠদ্বয় ফাঁক করিয়া আধ মিনিট অন্তর শ্বাস বাহির করিতেছেন। চক্ষু অর্ধ নিমীলিত, সমাধিতে মগ্ন। ব্যস্, সব শেষ! সব স্থির! এখন সাড়ে পাঁচটা। দিবাকর এখনও উদিত হয় নাই।*

৩

শ্রীম পরব্রহ্মে লীন হইলেন। আমরা আর তাঁহার পার্থিব রূপ দর্শন করিতে পারিব না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাযন্ত্রটির সহায়ে স্বীয় অবতারলীলা প্রকাশ ও প্রচার করিলেন সুদীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া, আজ সেই যন্ত্রটিকে চিরতরে বিশ্রাম প্রদান করিলেন। শ্রীম বিশ্রাম চাহিতেছিলেন। মহাকার্য অবসানে আজ সেই চির শান্তিময় বিশ্রাম লাভ করিলেন। পার্থিব যন্ত্রণা আর স্পর্শ করিতে পারিবে না। দিব্য ব্রহ্মপুরে এখন পরমানন্দে বিরাজ করিবেন। পরব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় ক্রোড়ে আরূঢ় শ্রীম। এখন কেবল ব্রহ্মানন্দসম্ভোগ।

ভক্তগণ এইবার শ্রীম-র পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ে ধারণ করুন। সংসারের শত দুঃখ জ্বালার ভিতরও ঐ দিব্য চরিত্র স্মরণ করুন। আর সদা মনন করুন মহাযাত্রা কালের মহাবাণী — 'গুরুদেব, মা কোলে তুলে ন্যাও'। 'গুরুদেব, মা' — ব্রহ্ম ও শক্তিকে, সদা নিদিধ্যাসন করুন আর জীবন্মুক্তির আনন্দ উপভোগ করুন।

এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া সাধু, তুমি তোমার তপস্যার অভিমান ত্যাগ কর। ভক্ত, তুমি তোমার ভক্তির অভিমানও ত্যাগ কর। ধনী, ত্যাগ কর ধনের অভিমান। পণ্ডিত, ত্যাগ কর পাণ্ডিত্যাভিমান। গুণী, মানী, সকলে সব অভিমান ত্যাগ কর। পার্থিব সকল অভিমান ত্যাগ কর, পৃথিবীবাসী জনগণ। কেবল এই অভিমান গ্রহণ কর, আমি অমৃতের সন্তান — 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। তাহা হইলে এখানে শত যন্ত্রণার ভিতর থাকিয়াও

---

* এই সকল বিবরণ অন্তেবাসী কর্তৃক ব্রহ্মচারী বলাই ও শ্রীম-র জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রভাস গুপ্তের নিকট হইতে শ্রীম-র মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই সংগৃহীত।

আনন্দে থাকিবে। শরীর ত্যাগ করিয়া আবার পরমানন্দই লাভ করিবে।

বহুবার কীর্তিত ঠাকুরের এই মহাবাণী এই মাত্র সেদিন আবার শ্রীম আমাদিগকে শুনাইয়া গেলেন — ‘একটা ভাব আশ্রয় কর। তা হলে বিপথে যাবার আশঙ্কা কম। যদি কারও সন্তানভাব ভাল লাগে তবে মন সঙ্কুচিত হয়ে যাবে অন্যায় কাজ করতে। বাপের ব্যাটা হতে চাইবে মন। তেমনি দাস, ভক্ত, কিংবা সোঽহং — একটা ভাব ধর।’

একজন সাধু ভাবিতেছিলেন ঐ কথা শুনিয়া, সে দিন আমার মনের গুপ্ত ভাবটি বুঝি আজ ধরিয়া বাহির করিয়া দিলেন শ্রীম — ‘পরমপিতার পুত্র আমি’।

অন্তেবাসীর হৃদয়ে বিগত এক যুগের কত কথাই যুগপৎ উদিত হইতে লাগিল বায়স্কোপের ছবির মত মনসাগরে, মৃদু মধুর তরঙ্গের মত নৃত্যানন্দে। অন্তেবাসী ভাবিতেছেন, গত বৎসরও এই দিনে শ্রীম আমাকে স্নেহালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া অভয় দিয়াছিলেন, ‘ভয় কি, বাপ-মাওয়ালা ছেলের মত থাকবে আনন্দে ও নিশ্চিন্তে’।

অন্তেবাসী আজ অন্তরে মৌন প্রার্থনা করিতেছেন — ‘ঠাকুর, গুরুমুখী এই মহাবাণী যেন সর্বদা স্মরণ থাকে। কেবল তোমাকে আশ্রয় করে যেন জীবনযাপন করতে পারি। তাঁর শেষ উপদেশ যেন পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন তাঁর জীবনের ছায়ারূপ ধারণ করে সদা অনুগত থেকে। ঐ দৈবী ভক্তিবিশ্বাসের কণামাত্রেই আমরা ভরপুর হয়ে যাব। এই প্রার্থনা।’

কিছুকাল পূর্বে অন্তেবাসীর মনে মৃত্যুর একটি সুখময় চিত্র প্রায়ই উদিত হইত বৈদ্যনাথ ধামে। একটি ছেলে সুখে নিদ্রামগ্ন। প্রশান্ত, প্রগাঢ় সুষুপ্তিময়। এই সুখানন্দময় অবস্থায় যদি তাহার সূক্ষ্ম শরীরটি কোলে তুলিয়া লইয়া যান ঠাকুর ও মা — ব্রহ্ম ও শক্তি, তবে তো সে আর মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিবে না। সুষুপ্তিতে নিত্য যে ব্রহ্মানন্দে লীন হয় জীব — ঐ জীবটি আর ঐ মহানন্দ হইতে বিচ্যুত হইবে না। তাহার এই মহানন্দের বহিঃপ্রকাশ হইবে কেবল মুখমণ্ডলে, আনন্দোজ্জ্বল প্রশান্ত মুখশ্রীতে। শ্রীম-র মুখমণ্ডলে মহাসমাধিতে আজ সেই দিব্যোজ্জ্বল ভাবটি অনুরঞ্জিত।

ওঁ শান্তিঃ। ওঁ শান্তি॥ ওঁ শান্তি॥।